ডিসেম্বর ২০২৪

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

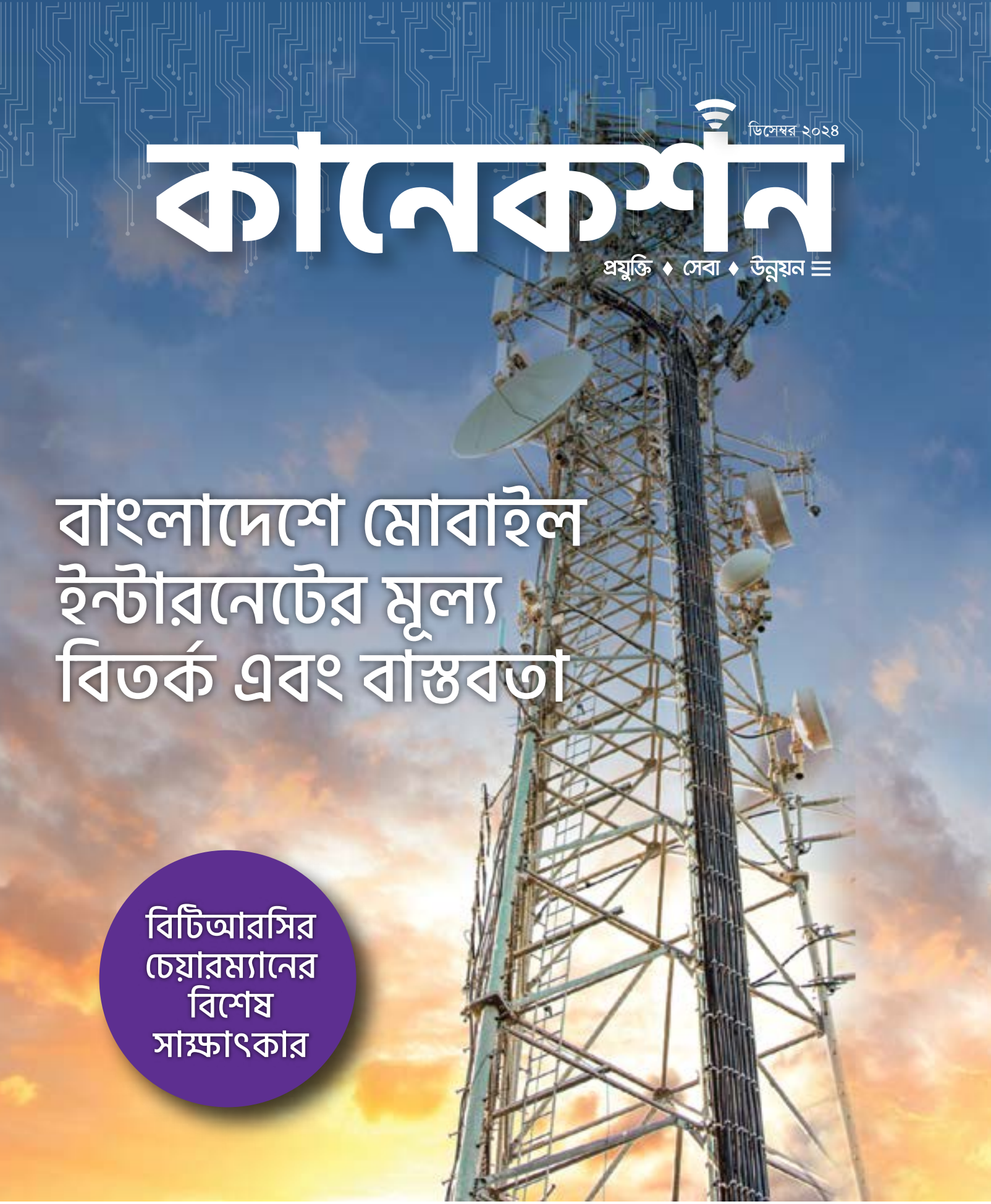

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য বিতর্ক এবং বাস্তবতা

বিটিআরসির চেয়ারম্যানের বিশেষ সাক্ষাৎকার

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

banglalink গ্রামীণফোন রবি teletalk
ERICSSON HUAWEI NOKIA

কানেকশন
প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন
AMTOB Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
নিউজলেটার বর্ষ-০৯, সংখ্যা-২

>> সূচীপত্র

০৪ বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য বিতর্ক এবং বাস্তবতা

১০ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবসায় রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সন্তোষজনক নয়

১৬ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশন : টেকসই ব্যবসা ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ

২০ ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এখন সময়ের দাবি

২২ ডিজিটাল অগ্রযাত্রার অনন্য সহযোগী টেলিযোগাযোগ শিল্প : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

২৫ ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ এবং ৫জি প্রযুক্তির মাধ্যমে তা অতিক্রম করার উপায় বাংলাদেশে

২৮ দ্য স্টেট অব মোবাইল ইন্টারনেট কানেকটিভিটি- ২০২৪

৩২ মোবাইল প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

৩৪ বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন

৩৬ সদস্যদের কার্যক্রম

>> সম্পাদনা পরিষদ

লে. কর্নেল মোহম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

তানভীর মোহাম্মদ
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনূর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অফ কমিউনিকেশন, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি ইন্টারনেট গ্রাহককে সেবা প্রদান করে আসছে যা মানুষের জীবনমানকে সহজ ও উন্নততর করতে এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সময়ের সাথে সাথে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের হার একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি দিন দিন আরও উন্নত প্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্ক বিস্তারের কারণে বিশ্বমানের মোবাইল ও ডাটা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতির আরও উন্নয়ন সাধনের উপায় আছে বলে আমরা মনে করি।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি হলেও, একাধিক সিম ব্যবহারকারীর কারণে সক্রিয় মোবাইল সংযোগের সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি। তবে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশের সামগ্রিক অবস্থা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সিমের উপর ভ্যাট (সিম ট্যাক্স) ২০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা করার কারণে মোবাইল গ্রাহক ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা আশা করি, সরকার এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং যথাবিহীত সিদ্ধান্ত নেবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, দেশের প্রায় ১০০ শতাংশ এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কাভারেজ থাকলেও জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ এখনও ইন্টারনেট সংযোগের বাইরে। এই সংযোগহীনদের সংযুক্ত করতে নীতিগত সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।

আমরা মোবাইল টেলিকম সেবা প্রদানকারীরা এমন ধরনের নীতিমালার জন্য সুপারিশ করি যা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, অধিক টেকসই হবে, বর্তমান জটিল টেলিকম ইকোসিস্টেমকে সহজ করবে এবং এই খাতে যৌক্তিক কর কাঠামো নিশ্চিত করবে। এই পদক্ষেপগুলো শিল্পের বর্তমান বাধাগুলো দূর করতে এবং সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে সংযোগহীনদের সংযুক্ত করার লক্ষ্য অর্জন এবং আরও উন্নত সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি হবে।

কানেকশনের এই সংখ্যায় আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পাশাপাশি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাৎকারসহ খাত সংশ্লিষ্টদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। আমাদের এই প্রয়াস পাঠকদের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামান্যতম উপকারে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

লে. কর্নেল মোহম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

বাংলাদেশ এখন এক তাৎপর্যপূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যার অগ্রভাগে আছে দেশের উদ্যমী ও প্রযুক্তিপ্রেমী যুবসমাজ। উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুগম করতে এই প্রাগ্রসর প্রজন্ম প্রস্তুত। অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ফিনটেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ই-কমার্সের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যার ফলে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিপুল সম্ভাবনাকে উন্মোচন করতে হলে যুব প্রতিভাকে ক্ষমতায়িত করে প্রবৃদ্ধির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং প্রগতিশীল সরকারি নীতি। উদ্ভাবন-বান্ধব নীতিমালা, উন্নত অবকাঠামো, তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সরকার যুবসমাজের মধ্যে উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি করতে পারে। এর ফলে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারবে।

টেলিযোগাযোগ খাত এই রূপান্তরের মূল ভিত্তি যা নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনকে নিশ্চিত করে। জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে নানা ধরনের আইডিয়া ও সলিউশনের বিস্তৃতি ঘটাতে উচ্চগতির ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করা অপরিহার্য। সরকার এবং টেলিযোগাযোগ শিল্পের মধ্যে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে যা প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক।

এই সমন্বয় কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিপ্লব আনতে সক্ষম যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিক ডিজিটাল বিপ্লবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। একইসাথে মানুষের জীবনমান উন্নত করে সকলের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। সৃজনশীলতাকে উন্মুক্ত করে বাংলাদেশের যুবসমাজে বিনিয়োগ করার এখনই সময় যাদের মাধ্যমে দেশ বৈশ্বিক ডিজিটাল বিপ্লবের অগ্রভাগে সামিল হবে।

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন লিমিটেড

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

>> এমটব বোর্ড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

রাজীব শেঠী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

লে. কর্নেল মোহম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব
এমটব

>> এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য বিতর্ক এবং বাস্তবতা

■ সাহেদ আলম

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার দাম নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের ডেটার দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। কিছু গণমাধ্যমেও এ বিষয়ে প্রায়শই বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন দেখা যায়। তবে বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি নয়, বরং বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদানের সার্বিক ইকোসিস্টেম এবং আরোপিত উচ্চ কর বিবেচনায় তা অনেক সাশ্রয়ী। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপি মোবাইল ইন্টারনেট সেবার মূল্য, মোবাইল ইন্টারনেট সেবার গতি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিবেচনার প্রেক্ষিতে তুলনা করে থাকে। যা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তব অবস্থার নির্দেশক নয়। কাজেই কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশভিত্তিক র‍্যাংকিং কে বিবেচনার ক্ষেত্রে তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি সর্বদা বিশদভাবে পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার প্রকৃত মূল্য ও নির্ভরশীল ফ্যাক্টরসমূহ

মোবাইল ইন্টারনেটের দাম সরাসরিভাবে অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমে দেখতে হবে মোবাইল ইন্টারনেট একজন গ্রাহকের হ্যান্ডসেটে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে পৌঁছায়। ধরা যাক একজন গ্রাহক নেটফ্লিক্স এর মাধ্যমে কোনো মুভি দেখবেন। প্রথমেই হ্যান্ডসেটটি মোবাইল ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে তার নিকটস্থ টাওয়ার বা অন্য

চিত্র: মোবাইল ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক টপোলজি

অবকাঠামোতে অবস্থিত মোবাইল সাইটের সাথে স্পেকট্রাম তথা বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে নেটফ্লিক্স এপ্লিকেশন ব্যবহার করে ডেটা সেশন শুরু করেন। এই ডেটা সেশন গ্রাহকের হ্যান্ডসেট থেকে শুরু হয়ে নেটফ্লিক্স সার্ভার হয়ে আবার গ্রাহকের হ্যান্ডসেটে পৌঁছায় এবং গ্রাহক মুভি দেখতে পান। এই ডেটা পরিবহনে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এবং অনেকগুলো বিষয় সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট।

১. গ্রাহকের হ্যান্ডসেট মোবাইল অপারেটরের সিমের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে টাওয়ার বা অন্য অবকাঠামোতে অবস্থিত মোবাইল সাইটের সাথে সংযুক্ত হয়। এখানে মোবাইল অপারেটররা বেতার তরঙ্গ বিটিআরসি এর কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে বরাদ্দ নিয়ে থাকে এবং একইসাথে প্রতি বছর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক ফি প্রদান করে। একইসাথে তাদেরকে মোবাইল সাইট স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ, সম্প্রসারণের মোবাইল অপারেটরদেরকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ ও প্রতিনিয়ত ব্যয় করতে হয়। মোবাইল সাইট সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট টাওয়ারে অবস্থিত রেখে চলমান রাখতেও টাওয়ার সেবা প্রদানকারীদেরকে উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হয়।

২. মোবাইল সাইট হতে অন্য মোবাইল সাইট এর সংযোগ স্থাপনে অপটিক্যাল ফাইবার এবং মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। মোবাইল অপারেটরদেরকে ডেটা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই ফাইবার এনটিটিএন (ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক) সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে মাসিক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য অর্থের প্রদান প্রদান করে নিতে হয়।

৩. ইন্টারন্যাশনাল ডেটা ট্রাফিক গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা দেশের বাইরে অবস্থিত সেবা সংশ্লিষ্ট সার্ভার (যেমন নেটফ্লিক্স ইত্যাদি) হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) থেকে ব্যান্ডউইথ কিনে থাকে। এই ব্যান্ডউইথ সবসময়ই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বরাদ্দ থাকে। যদি এই মেয়াদের মধ্যে তা ব্যবহার করা না যায়, তবে তা মোবাইল অপারেটরদের জন্য মূল্যহীন হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ ব্যান্ডউইথ ব্যবহার না হলেও মোবাইল অপারেটরকে ঐ রাস্তা নিয়ে রাখার জন্য খরচ করতেই হয় এবং আইআইজিকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে হয়।

৪. আইআইজি এই ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ সাবমেরিন ক্যাবল অথবা ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটর হতে নিয়ে থাকে। এই সাবমেরিন ক্যাবল অথ বা ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) সমূহ ইন্টারন্যাশনাল অপারেটদের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট সেবা সার্ভারে সংযুক্ত হয় তথা নেটফ্লিক্স সার্ভারে সংযুক্ত হয়।

> মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর জড়িত এবং মোবাইল অপারেটরদের মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদানে আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) হতে নেয়া ব্যান্ডউইথই একমাত্র খরচের জায়গা নয়। এখানে লক্ষণীয় যে মোবাইল অপারেটরদের মোবাইল ডেটা সেবা প্রদানের সামগ্রিক ব্যয়ের মাত্র ২.৭% হচ্ছে আইআইজি ব্যান্ডউইথ খরচ।

৫. ধাপ ১-৪ এর মাধ্যমে গ্রাহকের মোবাইল ইন্টারনেট সেবার অনুরোধ সংশ্লিষ্ট সার্ভারে পৌঁছায় এবং ঠিক উল্টো পথে সংশ্লিষ্ট সেবা সার্ভারে হতে ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টিভিটি দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল অথবা ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) হয়ে আইআইজি এর মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের কাছে পৌঁছায়। পরবর্তীতে অপটিক্যাল ফাইবার হয়ে মোবাইল সাইটের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে গ্রাহকের হ্যান্ডসেটে পৌঁছায়।

অর্থাৎ উপরোক্ত ধাপসমূহ থেকে খুবই স্পষ্ট যে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর জড়িত এবং মোবাইল অপারেটরদের মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদানে আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) হতে নেয়া ব্যান্ডউইথই একমাত্র খরচের জায়গা নয়। এখানে লক্ষণীয় যে মোবাইল অপারেটরদের মোবাইল ডেটা সেবা প্রদানের সামগ্রিক ব্যয়ের মাত্র ২.৭% হচ্ছে আইআইজি ব্যান্ডউইথ খরচ। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গ্রাহক এবং মোবাইল অপারেটরদের

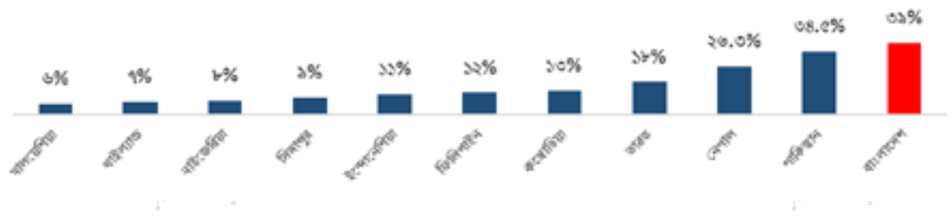

ওপর আরোপিত বিভিন্ন কর, ট্যাক্স, মোবাইল অপারেটরদের পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি খাতও গ্রাহক পর্যায়ে সার্বিক ডেটার মূল্য নির্ধারণে জরুরি বিষয়। উচ্চ কর হার, রেগুলেটরি ফিও গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ডেটার মূল্য বৃদ্ধি করে।

গ্রাহক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক মোবাইল সেবার উপর আরোপিত উচ্চ কর হার

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটাসহ সকল মোবাইল সেবা উপর ভ্যাট- ১৫%, সম্পূরক শুল্ক- ২০% এবং সারচার্জ- ১% আরোপিত রয়েছে। সার্বিকভাবে সর্বমোট কার্যকরী করের পরিমাণ ৩৯%। অর্থাৎ ১০০ টাকা সম-পরিমাণের মোবাইল ডেটা ব্যবহারে গ্রাহকে ১৩৯ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, যার ৩৯ টাকা সরকারকে প্রদান করতে হচ্ছে। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। নিম্নে উল্লেক্ষিত মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান দেশসমূহে গ্রাহকের উপর আরোপিত মোবাইল কর হারের পরিমাণ বাংলাদেশে থেকে অনেক কম।

মোবাইল অপারেটরদের আয়ের অনুপাতে প্রদানকৃত ট্যাক্স এবং রেগুলেটরি ফি (২০২২)

	৫১%
সাব-সাহারান আফ্রিকা	৩৫%
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	২৪%
এশিয়া প্যাসিফিক	২৪%
বৈশ্বিক গড়	২২%
ইউরোপ	২১%
ল্যাটিন আমেরিকা	১৮%

এছাড়াও মোবাইল সিমের উপর গ্রাহক পর্যায়ে বর্তমানে ৩০০ টাকা সিম ট্যাক্স রয়েছে। যা গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল অপারেটররা বেশিরভাগ সময়ে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এই সিম ট্যাক্সের কারণেও মোবাইল সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই উচ্চ সিম ট্যাক্স গ্রাহক প্রবৃদ্ধিতেও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে করপোরেট করের সর্বোচ্চ হার

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে করপোরেট করের হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় সর্বোচ্চ। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনসহ ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে করপোরেট করের হার সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের সকল দেশের মোবাইল অপারেটরদের উপর আরোপিত করপোরেট করের হারের গড় হচ্ছে ২৫%। বাংলাদেশে মোবাইল কোম্পানির ক্ষেত্রে এই করের হার ৪৫% এবং মোবাইল কোম্পানিটি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে এটি ৪০%। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সাধারণ কোম্পানির ক্ষেত্রে এই কর হার যথাক্রমে ২৭.৫% এবং ২২.৫%।

অপারেটরদের লাভ বা লোকসান যাই হোক, কর্পোরেট কর হার বিবেচনায় প্রদত্ত কর এর পরিমাণ তাদের মোট আয়ের ওপর ২ শতাংশ এর পরিমাণ হতে বেশি হলে ২% ন্যূনতম টার্নওভার ট্যাক্স হিসেবে দিতে হয়। তামাক কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম টার্নওভার ট্যাক্স হার ৩ শতাংশ এবং কর্পোরেট কর হার ৪৫%। তামাক খাত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এর কোন ইতিবাচক অবদান জনসাধারণের জীবনযাত্রায় নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে মোবাইল অপারেটরদের প্রদত্ত সেবা ব্যবহার করে সারাদেশে সংযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি, নতুন নতুন ডিজিটাল সেবার খাত সৃষ্টি, ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখা স্বত্ত্বেও এই খাতের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করা হয়েছে, যা বেশ অযৌক্তিক এবং সমীচীন নয়।

এই উচ্চ কর হারও গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল সেবার মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম আরেকটি কারণ। যৌক্তিক কর নির্ধারণের মাধ্যমে মোবাইল ফোন সেবা আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করা সম্ভব। করের হার কমালে গ্রাহকরা বেশি করে মোবাইল সেবা ব্যবহার করতে পারবে, যা সরকারের রাজস্ব বাড়াতে সহায়ক হবে।

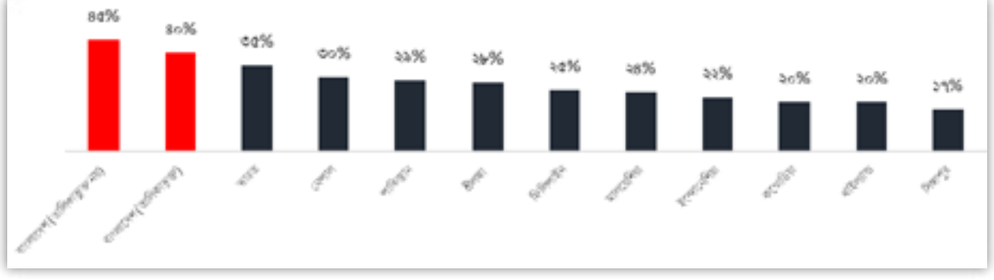

বিভিন্ন দেশে মোবাইল অপারেটরদের ওপর আরোপিত কর্পোরেট কর হার নিম্নরূপ-

মোবাইল অপারেটরদের উপর আরোপিত ট্যাক্স এবং রেগুলেটরি ফি

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চল এর তুলনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরদের প্রদানকৃত ট্যাক্স এবং রেগুলেটরি ফি তাদের রাজস্বের শতকরা হিসেবে অনেক বেশি। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে এর পরিমান ২৪% হলেও বাংলাদেশে তা সর্বদা ৫০% এর অধিক। অর্থাৎ এই উচ্চ কর ও রেগুলেটরি ফি হ্রাস করা হলেও গ্রাহক পর্যায়ে ডেটার মূল্য হ্রাস করা সম্ভব।

মোবাইল ইন্টারনেট সেবার প্রকৃত গতি

মোবাইল ইন্টারনেট সেবার গতি গ্রাহক পর্যায়ে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে গ্রাহকের হ্যান্ডসেটের সক্ষমতা, গুণগতমান গ্রাহকের ঘনত্ব, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সার্বিক ডেটা ব্যবহারের চাহিদা, মোবাইল নেটওয়ার্কের ডেটা ট্র্যাফিক পরিবহনের ক্ষমতা, অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে একটি দিনের ২৪ ঘন্টার সবসময় ডেটার ব্যবহার সমান হয় না। এ কারণেই মোবাইল অপারেটরদের দিনের সর্বোচ্চ ডেটা ব্যবহারের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নেটওয়ার্কের সক্ষমতা তৈরি করে রাখে। কাজেই সার্বক্ষণিকভাবে উচ্চগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে গেলে ইকো-সিস্টেমের সংশ্লিষ্ঠ সকল অপারেটরদেরকে অতিমাত্রিক পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে। যা বর্তমান আয়ের অনুপাতে কখনই টেকসই হবে না। বরং গ্রাহককে আরো উচ্চমূল্যে ডেটা ক্রয় করতে হবে।

ডেটা প্যাকেজের দাম ও মেয়াদ

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, গতিভিত্তিক ব্যান্ডউইথ মানেই ইন্টারনেট নয়। গতি হচ্ছে মোবাইল ইন্টারনেট তথা ডেটা ভলিউম ব্যবহার করার গতিভিত্তিক সক্ষমতা। মোবাইল ইন্টারনেট প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথের মেয়াদ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিটি প্যাকেজের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ দেওয়া থাকে এবং সেই সময়ের মধ্যে ডেটা ব্যবহার করতে হয়। যদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে প্যাকেজের ডেটা ব্যবহার করা যায় না। এটি অনেকটা হোটেল বুকিংয়ের মতো। আপনি যদি একটি হোটেল রুম নির্দিষ্ট তারিখের জন্য বুক করেন এবং সেই সময়ে না যান, তাহলে আপনার বুকিং বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি ব্যবহার না করলেও যেহেতু সেই সময়ের জন্য আপনার বরাদ্দকৃত রুম অন্য কোনো মানুষকে ভাড়া/বরাদ্দ দেওয়া হয়নি, তাই তার খরচ আপনাকেই বহন করতে হবে। মোবাইল ইন্টারনেট প্যাকেজের মেয়াদও ঠিক এই নিয়মে চলে। ক্রয় সাপেক্ষে আপনার জন্য বরাদ্ধকৃত ডেটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনি ব্যবহার করুন বা না করুন মোবাইল অপারেটরদের ঠিকই ঐ ডেটার ব্যয় বহন করতে হয়। কাজেই গ্রাহকের ডেটা অব্যবহৃত থাকলেও ডেটার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং গ্রাহককে নতুন করে ডেটা ক্রয় করতে হয়। আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) থেকে কেনা ব্যান্ডউইথ সবসময়ই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কাজেই গ্রাহক ডেটা ব্যবহার না করলেও মোবাইল অপারেটদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানে সার্বিক নেটওয়ার্ক পরিচালনার খরচ ঠিকই বহন করতে হয়।

> আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) থেকে কেনা ব্যান্ডউইথ সবসময়ই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কাজেই গ্রাহক ডেটা ব্যবহার না করলেও মোবাইল অপারেটদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানে সার্বিক নেটওয়ার্ক পরিচালনার খরচ ঠিকই বহন করতে হয়।

মোবাইল ইন্টারনেট প্যাকের মূল্য গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা, ডেটা ব্যবহারের ধরণ, ডেটার পরিমাণ, প্রদত্ত মেয়াদ, বাজার প্রতিযোগিতা, নতুন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কাজেই মোবাইল ডেটার মূল্যকে সাধারণভাবে প্রচলিত কোন পদ্ধতিতে নির্ধারণের কোন অবকাশ নেই।

ডেটা প্যাকের মূল্য ও ব্যবহারের তুলনা : বাংলাদেশ ও ভারত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩০ দিনের প্যাকেজে এক জিবি ডেটার দাম বিভিন্ন অফার অনুযায়ী গড়ে ১২-১৩ টাকা। নিকটতম প্রতিবেশী ভারতে জিও এর ২৮ দিন মেয়াদে ১০ জিবি ডেটা কিনতে ১৭৫ রুপি (২৭৫ টাকা) খরচ হয়। অর্থাৎ এক জিবি ডেটার দাম ১৯.৫ রুপি (প্রায় ২৮ টাকা)। এছাড়াও আমরা যদি বিভিন্ন প্যাকেজভেদে মোবাইল ডেটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যের তুলনা করি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ৯ টাকা দিয়েও মোবাইল ডেটা প্যাক ব্যবহার করা সম্ভব। পক্ষান্তরে

ভারতে সর্বনিম্ন মূল্যের ডেটা প্যাক ব্যবহার করতে হলে আপনি যদি জিও এর গ্রাহক হন, আপনাকে ৪৯ রুপি (৭০ টাকা) খরচ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রের বিবেচনাতেও সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশে মোবাইল ডেটার মূল্য এবং ডেটা প্যাক ক্রয় সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ডেটা গ্রাহক প্রতি মাসে গড়ে ৭ জিবি ডেটা ব্যবহার করে। বিশ্বব্যাপী এর পরিমাণ ১৩ জিবি, যা ভারতে ১৭ জিবি। ডেটা ব্যবহার মোবাইল নেটওয়ার্কে যত বৃদ্ধি পাবে, গ্রাহক পর্যায়ে ডেটা নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ব্যাপকতাকে কাজে লাগিয়ে তত বেশি সাশ্রয়ীমূল্যে সেবা প্রদান করা সম্ভব। অর্থ্যাৎ বাংলাদেশে ডেটার ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে আরো সাশ্রয়ীমূল্যে গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ডেটা সেবা প্রদান করা সম্ভব।

ডেটা সরবরাহের স্তর, লাইসেন্সিং পরিকাঠামো ও ডেটা সেবা প্রদানে এর প্রভাব

বাংলাদেশে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে মোবাইল ডেটা সেবা প্রদান করা সম্ভব। বর্তমানে মোবাইল ডেটা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরকে অনেকগুলো স্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। এই স্তরের মধ্যে রয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল, এনটিটিএন (ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক), আইআইজি, টাওয়ার কোম্পানি, ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের মোবাইল অপারেটরদের ন্যায় বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটররা যদি এই স্তরগুলো নিজেরাই পরিচালনা করতে পারতো তা হলে ডেটা সেবার মূল্য আরো কমিয়ে আনা সম্ভব। এই স্তরগুলোর পরিচালন ব্যবস্থাপনা আলাদাভাবে থাকার ফলে ডেটা সরবরাহের খরচ বেড়ে যায়। অন্যান্য অনেক দেশে এই স্তরগুলো মোবাইল অপারেটররা সরাসরি পরিচালনা করে, যা তাদের খরচ কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশে এই স্তরগুলো বাধ্যতামূলক হওয়ায় খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই টেলিযোগাযোগ লাইসেন্স কাঠামোতে সরলীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার হয়। যার মাধ্যমে মোবাইল অপারেটররা টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেমের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টাওয়ার, ফাইবার, ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথসহ অন্যান্য সকল অবকাঠামো প্রয়োজনে নিজেই পরিচালনা করতে পারে। এসব দেশের মধ্যে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, কাতার, কানাডা অন্যতম। অথচ বাংলাদেশে এ বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বিপরীত এবং মোবাইল অপারেটরদেরকে অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের উপর নির্ভর করতে হয়। যা একদিকে যেমন ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, আবার অন্যদিকে গ্রাহক পর্যায়ে ডেটার মূল্যও বৃদ্ধি করেছে। এই লাইসেন্স কাঠামোর পরিবর্তন করা হলে ডেটার মূল্য হ্রাস পাবে, বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার প্রসার ত্বরান্বিত হবে এবং একইসাথে এই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। কাজেই এই স্তর ব্যবস্থায় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

বিভিন্ন দেশের ARPU-এর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ

দেশ	গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় (Average Revenue per User -ARPU) (USD)	গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় (Average Revenue per) User -ARPU) (USD)
বাংলাদেশ	১.২২	১৪৫
ভারত	২.০৮	২৪৯.৬
পাকিস্তান	১.০৫	১২৬
নেপাল	১.১৩	১৩৫.৬
শ্রীলঙ্কা	১.১৬	১৩৯.২
মালয়েশিয়া	৯.৩৭	১১২৪.৪
ইন্দোনেশিয়া	২.৫৮	৩০৯.৬
সিঙ্গাপুর	১৮.৭	২২৪৪
থাইল্যান্ড	৬.০৩	৭২৩.৬
নাইজেরিয়া	১.৫৮	১৮৯.৬
ঘানা	২.৫৭	৩০৮.৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪.৯৪	৫৯২.৮
যুক্তরাজ্য	১৭.৪২	২০৯০.৪
জার্মানি	১২.১৫	১৪৫৮
বিশ্বব্যাপি	৮.১৪	৯৭৬.৮

অথচ বাংলাদেশে ARPU এর পরিমাণ মাত্র ১.২২ ডলার (১৪৫ টাকা)। যা মূলত নির্দেশ করে বাংলাদেশের গ্রাহকের মোবাইল সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি খরচ করছে না। গ্রাহকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতেই বাংলাদেশে সাশ্রয়ী দামে ডেটা প্যাকেজ দিতে হচ্ছে। গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় মোবাইল অপারেটরদেরকে টেকসই ব্যবসা পরিচালনার জন্য ডেটার মূল্য নির্ধারণের একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। একারণেও বিভিন্ন দেশের ডেটার মূল্যও বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে উচ্চ কর হার যৌক্তিকরণ, ইকো-সিস্টেম এর জটিলতা নিরসন, স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা গেলে আরো সাশ্রয়ীমূল্যে মোবাইল ডেটা সেবা গ্রাহককে প্রদান করা সম্ভব।

মোবাইল ডেটার দাম এবং সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এর সীমাবদ্ধতা

বৈশ্বিকভাবে মোবাইল ডেটার মূল্য তুলনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন

মোবাইল গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় (ARPU - Average Revenue Per User) এবং ডেটার মূল্য

বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় হচ্ছে ১৪৫ টাকা, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন দেশগুলোর একটি। এই পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের গ্রাহকরা তুলনামূলক ভাবে সাশ্রয়ীমূল্যে বর্তমানে সেবা ব্যবহার করছে এবং পক্ষান্তরে নিম্ন অজচট এর কারণে মোবাইল অপারেটরদের ডেটার মূল্য আরও হ্রাস করলে তা ব্যবসায়িকভাবে টেকসই হবে না। বিশ্বব্যাপি সকল দেশের বিবেচনায় মাসিক ARPU হচ্ছে প্রায় ১,০০০ টাকা এবং ভারতে ARPU হচ্ছে ২৫০ টাকা।

গ্রাহক হতে প্রাপ্ত ১০০ টাকার মোবাইল অপারেটর পর্যায়ে খরচের বিবরণ

খাত	বিস্তারিত	পরিমাণ (টাকা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	গ্রাহক কর (ভ্যাট - ১৫%, সম্পূরক শুল্ক- ২০% এবং সারচার্জ- ১%)	২৮
	সিম ট্যাক্স, কাস্টম ডিউটি, কোম্পানি ট্যাক্স	১৩.৪
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	লাইসেন্স ফি, স্পেকট্রাম ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং, এসওএফ	১৪.৪
ইকোসিস্টেম স্তরগুলোর খরচ	টাওয়ার, এনটিটিএন- ফাইবার, আইসিক্স, আইজিডাব্লিউ, আইআইজি, ভ্যাস সেবা প্রদানকারী, মোবাইল টারমিনেশন রেট	১৭.৩
অপারেটিং (পরিচালনা) খরচ	নেটওয়ার্ক ওপেঙ, মার্কেটিং ওপেক্স, অ্যাডমিন, এইচআর, ফাইন্যান্স কস্ট ইত্যাদি।	২৫
মোবাইল অপারেটর এর মুনাফা		১.৯

প্রতিষ্ঠান নানা রকম পদ্ধতি ও বিবেচনার ভিত্তিতে করে থাকে। যেমন আইটিইউ এর পরিচালিত গবেষণা রিপোর্ট আইসিটি সেবার ক্রয়ক্ষমতা ২০২৩ প্রতিবেদনে কেবল প্রতিটি দেশের প্রথম তথা শীর্ষস্থানীয় মোবাইল অপারেটরের সর্বনিম্ন মূল্যের ডেটা প্যাক বিবেচনায় নিয়েছে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী অন্য মোবাইল অপারেটরদের অফারসমূহ বিবেচনা করা হয় নি। সার্ফসারক তার মোবাইল ডেটা ক্রয়ক্ষমতার র‍্যাংকিং করার সময় এটি ব্যবহার করেছে। যা বাস্তব অবস্থা নির্দেশ করে না। এছাড়া অনেক সময় cable.co.uk এর র‍্যাংকিং অনেকেই বিবেচনা করে থাকে। cable.co.uk এর র‍্যাংকিং মূলত তৈরি হয় অনলাইন তথা ওয়েবসাইটে যে অফারগুলো থাকে তার মূল্যের গড় করে, যা গ্রাহকের বাস্তব ডেটা ক্রয় ও ব্যবহারের আসল চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ। গ্রাহক পর্যায়ে সার্বিকভাবে মোবাইল ডেটার ক্রয়মূল্য কেমন তা নির্ধারণ করতে হলে গ্রাহকের সার্বিক ডেটা সেবার জন্য ব্যয় এবং তারা কী পরিমাণ ডেটা ক্রয় করেছে তার ভিত্তিতে নিরূপণ করা সমীচীন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোবাইল অপারেটরভিত্তিক তাদের মোবাইল ডেটা আয় এবং সংশ্লিষ্ট ডেটা গ্রাহক কর্তৃক ডেটা ব্যবহারের ভিত্তিতে ১ জিবি মোবাইল ডেটার দাম নিরূপণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরদের গড়ে ১ জিবি মোবাইল ডেটার মূল্য অন্যান্য দেশের মোবাইল অপারেটরদের থেকে কম। অর্থাৎ বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের ডেটা অন্যান্য দেশের তুলনায় সাশ্রয়ী। মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে প্রয়োজনীয় সকল সংস্কার করা সম্ভব হলে মোবাইল ডেটার মূল্য আরো কমিয়ে আনা সম্ভব।

গ্রাহকের ১০০ টাকা রিচার্জ এবং মোবাইল অপারেটরদের সার্বিক ব্যয় কাঠামো

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার দাম আন্তর্জাতিক তুলনায় বেশি নয়। তবে মোবাইল সেবায় গ্রাহক পর্যায়ে এবং মোবাইল অপারেটরদের ওপর আরোপিত উচ্চ কর, উচ্চ রেগুলেটরি ফি, স্তরভিত্তিক সেবা প্রদান কাঠামো, গ্রাহক বৃদ্ধিতে বিভিন্ন অসহায়ক রেগুলেটরি নীতিমালা ইত্যাদির কারণে গ্রাহক পর্যায়ে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। গ্রাহকের ১০০ টাকার রিচার্জ কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ হয় তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। এখানে লক্ষণীয় যে গ্রাহক করের অংশ ছাড়া বাকি অংশ গুলো অপারেটরভেদে তাদের আয়ের পরিমাণ, পরিচালনার ধরণ, মুনাফা/ক্ষতির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন হবে।

অর্থাৎ গ্রাহক ১০০ টাকা খরচ করলে তার ৫৬ টাকাই সরকারের কোষাগারে জমা পড়ছে। এই উচ্চ কর ব্যবস্থা এবং রেগুলেটরি ফি সার্বিকভাবে গ্রাহক পর্যায়ে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। একইসাথে মোবাইল অপারেটরদেরকে সেবা সম্প্রসারণের সক্ষমতাকেও খর্ব করছে। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, বর্তমান মোবাইল ডেটা সেবার সার্বিক অবস্থা, ইকোসিস্টেম এর খরচ, গ্রাহক কর, মোবাইল অপারেটরদের কর, অপারেটিং খরচ ইত্যাদি মিলিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে ডেটা মূল্য কমাতে গেলে মোবাইল এর সার্বিক সেবা টেকসই হবে না। কাজেই উচ্চ কর ব্যবস্থা এবং রেগুলেটরি ফি হ্রাসকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসমূহ অতিসত্ত্বর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

মোবাইল ডেটার মূল্য কমিয়ে আনতে সুপারিশসমূহ -

১. গ্রাহক পর্যায়ে কর হ্রাস। ডেটার তথা মোবাইল ইন্টারনেট সেবার উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জ প্রত্যাহার।

২. মোবাইল অপারেটরদের উপর আরোপিত কর্পোরেট কর হ্রাসকরণ।

৩. স্তরভিত্তিক লাইসেন্স ব্যবস্থা সংস্কার করে মোবাইল অপারেটরদের অন্যান্য লাইসেন্সদের উপর নির্ভরশীলতা দূরীকরণ।

৪. রেগুলেটরি ফি-সমূহ হ্রাস করা।

৫. টেলিযোগাযোগ খাতে বৈশ্বিক প্রমিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি, আইন ইত্যাদির সংস্কার ও নতুন প্রণয়ন।

লেখক : রবি আজিয়াটার চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার

সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবসায় রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সন্তোষজনক নয়

মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.)

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.) সম্প্রতি দেশের টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ে কানেকশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি এই খাতের সংস্কার, গুরুত্ব, অগ্রগতি, সেবা ও সেবার মান, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করেন।

আপনি একটা সময়ে বিটিআরসিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এমটব ও মোবাইলশিল্প খাতের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাই । এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথমেই আপনাকে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হচ্ছে?

মো. এমদাদ উল বারী: বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে একে টেকসই উন্নয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। একপেশে নীতিমালা প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি এর আশ্রয় এবং অপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে আজকে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ আইন অনুযায়ী কোন টেলিযোগাযোগ সেবা/পণ্য এর অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে বিটিআরসি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারছে না। বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন খাতে অতিরিক্ত লাইসেন্স প্রদান করার ফলে বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিগুলোর রিটার্ন কমে গিয়েছে, গ্রাহকদের মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যাঘাত ঘটছে এবং সার্বিকভাবে খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের অথোরিটি বিটিআরসির কাছে ন্যস্ত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এছাড়াও টেলিযোগাযোগ বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফলতা যদি আমাদের উপভোগ করতে হয়, তাহলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি জনসাধারণকে অধিকতর ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, সমগ্র দেশব্যাপী টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর বিস্তার ঘটানো সম্ভব হলেও সকল শ্রেণী পেশার মানুষের পক্ষে এই উপযোগিতা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর মূল কারণ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সচেতনতার অভাব। এই চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা অংশীজনদের থেকে অভিযোগ শুনে থাকি - বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেলিযোগাযোগ পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (ROI) সন্তোষজনক নয়। এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের প্রাথমিকভাবে সেবা গ্রহীতাদের চাহিদা এবং মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমাদের মাথায় রাখতে হবে টেলিযোগাযোগ সেবা এখন আর শুধুমাত্র ভয়েস এবং ডেটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তির বিপ্লবের সাথে সাথে টেলিযোগাযোগ সেবা/পণ্যের চাহিদাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সাথে গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী অংশীজনদের আক্ষেপ অনেকাংশেই হ্রাস হবে। জনগণের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে; তবে এই ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তবে, টাওয়ার শেয়ারিং নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের বাধা দূর করা হচ্ছে। এছাড়া

> বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন খাতে অতিরিক্ত লাইসেন্স প্রদান করার ফলে বাজারে অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিগুলোর রিটার্ন কমে গিয়েছে, গ্রাহকদের মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যাঘাত ঘটছে এবং সার্বিকভাবে খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গ্রামীণ এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিটিআরসি টেলিযোগাযোগ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি, যাতে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত আরও সমৃদ্ধ ও টেকসই হয়।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে সংযোগ বা কানেকটিভিটির কথা চলে আসে। বিটিআরসির অভিভাবকত্বে এই কানেকটিভিটির দায়িত্বে রয়েছে মূলত টেলিকম সেবাদাতারাই। এই গুরুদায়িত্ব বাস্তবায়নে আপনি বিটিআরসির লাইসেন্সিদের কীভাবে কাজে লাগাতে চান?

মো. এমদাদ উল বারী: এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যে, বিটিআরসির লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরদের মাধ্যমেই দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সংযোগ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা দুইটি পর্যায় বিবেচনা করতে পারি -- প্রথমত একসেস লেভেল এর সংযোগ, দ্বিতীয়ত ট্রান্সমিশন অবকাঠামো নির্মাণ। বিটিআরসি হতে উভয় ক্ষেত্রেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর রয়েছে এবং উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই আমরা পুরো দেশে একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ কাঠামো গড়ে তুলতে পারব। আমাদের দেশে টেলিকম সেবা প্রদানের যে বিস্তৃতি, তাতে দেশের সংযোগ অবকাঠামো আরো বেশি ব্যাপক এবং বিস্তৃত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দুইটি সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি, একটি হলো একসেস সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে অর্থাৎ মোবাইল অপারেটর এবং আইএসপি অপারেটরদের সঙ্গে এনটিটিএন অপারেটরদের যথাযথ ও কার্যকর সমন্বয়ের অভাব।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো আমাদের ট্রান্সমিশন সেবাপ্রদান ব্যবস্থায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব। এজন্য অভিযোগ আছে যে অনেক ক্ষেত্রেই মনোপলি/ডুয়োপলি তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবা গ্রহণের খরচও অনেক ক্ষেত্রেই বেশী এবং এর ফলশ্রুতিতে আরো বেশী অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে। আমরা উভয় সমস্যা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ক্যাটাগরি ভিত্তিক অপারেটরদের যে সক্ষমতা, তা যাতে সর্বোচ্চ কাজে লাগে ।

ফাইবার সেবা প্রদানকারী অপারেটরদের সাথে একসেস

> ফোরজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ফাইভজি প্রযুক্তি চালুর প্রস্তুতি, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক কাভারেজ বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের মোবাইল ফোন অপারেটররা নতুন প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার দৃষ্টান্ত অব্যাহত রেখেছেন।

সেবাদানকারী, যেমন মোবাইল ও আইএসপি অপারেটরদের সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য আমরা ফাইবার রিকোয়েস্ট/রিপ্লাই এর পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমরা বেসরকারি এবং সরকারি উভয় ধরনের এনটিটিএনকেই কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করব। আমরা এক্ষেত্রে একাধিক সভা করেছি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করব। একইসাথে আরেকটি বিষয় যা সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা গড় তোলার প্রতিবন্ধকতা হলো ডার্ক ফাইবার এবং ফাইবার ক্যাপাসিটির ট্যারিফ না থাকা। ট্যারিফ প্রণয়নের কাজ আমরা অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছি এবং তা শীঘ্রই জারি হবে। আশা করা যায় এ দুইটি পদক্ষেপের ফলে ফাইবার সেবা গ্রহণ-প্রদানের ব্যবস্থায় অধিকতর সমন্বয় গড়ে উঠবে। একসেস সেবা প্রদানকারিরা লাস্ট মাইলে কার্যকরভাবে ফাইবার স্থাপন করতে পারলে গ্রাহকদের সংযুক্ত করা এবং দেশব্যাপী একটি ভালো একসেস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে জটিলতাও আমরা দুরীভূত করছি।

ফাইবার সেবা প্রদানে অধিকতর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে আমরা একদিকে সরকারি সেবাপ্রদানকারীদের অধিকতর একটিভ করতে কাজ করছি। তাদের সঙ্গে সভা করে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, একইসঙ্গে তাদের যে সীমাবদ্ধতা, যেমন রেলওয়ে ট্র্যাকের বাইরে ফাইবার স্থাপনের সীমাবদ্ধতা বা পিজিসিবির গ্রিড লাইনের বাইরে ফাইবার স্থাপনের যে জটিলতা তা আমরা অচিরেই দূর করে এসকল রিসোর্স কার্যকর এবং জনবান্ধব ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছি। এ খাতে প্রতিযোগিতা আরো বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনে আরও লাইসেন্স প্রদান করা হবে। এছাড়াও আমাদের টেলিকমের নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং রেজিম পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে আমরা উন্মুক্ত এবং বাজার-ভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত অবদানে একটি কার্যকর সংযোগ কাঠামো গড়ে তুলতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের প্রায় শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আয়তায় আছে এবং আমাদের অপারেটররা তাদের গ্রাহকদের বিশ্বের প্রায় সর্বনিম্ন মূল্যে মোবাইল ডাটা (বিশ্বের ১২-তম নিম্নতম রেট কেবল ডট ইউকে ইনডেক্স) ও কল সুবিধা দিয়ে আসছে। ফলে অপারেটরদের বিনিয়োগের তুলনায় রিটার্ন অপেক্ষাকৃত কম - গ্রাহক প্রতি মাসিক গড় আয় ১৪০ টাকার মতো। তারপরেও অপারেটররা নিয়মিতভাবেই বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে মোবাইল শিল্প খাতের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন সংক্ষেপে জানতে চাই।

মো. এমদাদ উল বারী: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেলিযোগাযোগ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্রুত বিকাশমান শিল্প। দেশের প্রায় শতভাগ অঞ্চল বর্তমানে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে, যা একটি বড় সাফল্য। ফোরজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ফাইভজি প্রযুক্তি চালুর প্রস্তুতি, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক কাভারেজ বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের মোবাইল ফোন অপারেটররা নতুন প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার দৃষ্টান্ত অব্যাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট এবং সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় সাশ্রয়ী মূল্যে অপারেটররা সেবা প্রদান করে থাকেন। একইসাথে প্রযুক্তি হালনাগাদ এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য বিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে নতুন সেবা এবং ব্যবহার ক্ষেত্র চালু করার মাধ্যমে অপারেটররা গ্রাহকদের আকর্ষণ করতে এবং রিটার্ন বৃদ্ধি করতে পারবে। অপারেটরদের গ্রাহকদের চাহিদা এবং অন্যান্য দেশের মোবাইল অপারেটরদের সেবা বিশ্লেষণ করে নতুন সেবার ধারণা গ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রযুক্তি যেমন: ফাইভজি, আইওটি (ইন্টারনেট অফ থিংস), এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ব্যবহার করে নতুন এবং উদ্ভাবনী সেবা তৈরি করতে হবে এবং গ্রাহকদের জন্য সহজ ও সুলভ মূল্যে নতুন সেবা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও গ্রাহক পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে অপারেটরকে নির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল লিটারেসি উন্নয়ন, মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেমের বিস্তার, ডেটা-নির্ভর সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি করে এই খাতকে আরও উন্নত করা সম্ভব।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। নীতিগত সহায়তা, স্পেকট্রামের মূল্য সাশ্রয়ী রাখা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে একদিকে অপারেটররা যেন লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে, একইসাথে সমগ্র দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। মোটকথা, মোবাইল শিল্প খাত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ডিজিটাল অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি। অপারেটরদের অব্যাহত বিনিয়োগ, সরকারের নীতি সহায়তা এবং গ্রাহকদের অংশগ্রহণ এই খাতের ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ ও টেকসই করে তুলবে।

প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সংগে সংগে সেবার মান নিয়ে গ্রাহকদের প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোবাইল সেবার মান ও পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেমে কি ধরনের বাধা বা বটলনেক আছে বলে মনে করেন? বিটিআরসি এসব বাধা দূর করতে কী ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে?

মো. এমদাদ উল বারী: প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গ্রাহকদের প্রত্যাশা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে মোবাইল সেবার মান উন্নয়ন ও পরিধি সম্প্রসারণ একটি চলমান চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেমে কিছু নির্দিষ্ট বটলনেক বিদ্যমান, যা দূর করার মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আমরা সকলেই জানি মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্পেকট্রাম একটি অত্যাবশ্যক সম্পদ, যা মোবাইল অপারেটরদের উচ্চ গতির ও নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করতে সহায়ক। এই ক্ষেত্রে বিটিআরসি নিয়মিতভাবে স্পেকট্রাম নিলাম আয়োজন করছে এবং অপারেটরদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে এবং সহজতর শর্তে স্পেকট্রাম বরাদ্দের বিষয়ে নিয়মিতভাবে কাজ করছে। উপরন্তু ফাইভজি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা এবং যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করতে বিটিআরসি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করছে।

> আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালচনা করলে দেখা যায়, মোবাইল ইন্টারনেটের বিস্তারের পরও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক গ্রাহক এখনও ডিজিটাল সেবা ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না থাকায় ডেটা–নির্ভর সেবার শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় নি।

আমরা জানি দেশের গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতা, টাওয়ার স্থাপনে অনুমোদনের জটিলতা এবং সড়ক ও সেতুর মতো স্থাপনা ব্যবহার নিয়ে বিদ্যমান জটিলতার কারণে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে পরিত্রাণের ধাপ হিসেবে টাওয়ার শেয়ারিং নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপারেটরদের মধ্যে অবকাঠামোগত খরচ ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিশেষ নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়াও দেশের সর্বব্যাপী গ্রাহকদের ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকায় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নতুন প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে সাময়িক ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়; যেই চ্যালেঞ্জ সমাধানে গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্টফোন সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় মোবাইল ফোন নির্মাণ শিল্পের প্রসারণ নিশ্চিত করতে ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোবাইল ইন্টারনেটের বিস্তারের পরও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক গ্রাহক এখনও ডিজিটাল সেবা ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না থাকায় ডেটা-নির্ভর সেবার শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় নি। সরকার কর্তৃক ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। তবে একই সাথে প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রাহকদের আরো বেশী টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তোলার ক্ষেত্রে অপারেটর পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া জরুরি।

সর্বোপরি জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যেতে পারে, নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ ও গ্রাহক সেবার মান যাচাইয়ে বিটিআরসি একটি উন্নত মানের মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করেছে যা নেটওয়ার্কের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করে। গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী গ্রিভ্যান্স সিস্টেমও চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত একটি প্রতিশ্রুতিশীল অবস্থানে রয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে বিদ্যমান বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনে বিটিআরসি অপারেটরদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। সেবার মান ও পরিধি বাড়াতে সরকারের নীতি সহায়তা, অপারেটরদের বিনিয়োগ এবং গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি একত্রে এই খাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

আমরা জানি দেশে ফাইবার কেবল সেবাদাতা ও মোবাইল সেবাদাতাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা আছে। সকল মোবাইল টাওয়ারে ফাইবার সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটানো যাবে বলে মনে করেন?

মো. এমদাদ উল বারী: এই সমন্বয়হীনতা দূর করতে আমরা এরইমধ্যে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রথমত, একটি সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে ফাইবার সেবা গ্রহীতা এবং প্রদানকারীর মধ্যে রিকোয়েস্ট-রিপ্লাই কার্যক্রম নিয়ে আসা। এটির সফল বাস্তবায়ন হলে সকলেই পরিকল্পনামাফিক ফাইবার গ্রহণ-প্রদানের সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয়ত, এই খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। যে কোনো খাতে প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত থাকলে সেখানে আসলে সমন্বয়হীনতা থাকে না। এ লক্ষ্যে বেসরকারি এনটিটিএন অপারেটরদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরকারি এনটিটিএন অপারেটরদের আরো কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের আহবান জানিয়েছি, একই সঙ্গে তাদের যে নীতিগত সহায়তা দরকার, তা ইতিবাচকভাবে প্রদান করছি। আশা করা যায় অল্প সময়েই এই ব্যাপারে আমরা বেশ ভালো অগ্রগতি দেখব।

তৃতীয়ত, আমরা এনটিটিএন ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে কাজ করছি। বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ফাইবার ক্যাপাসিটি এবং ডার্ক ফাইবার এর ট্যারিফ নির্ধারণ করা গেলে এই পুরো

> মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ, যা সকল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি (যেমনঃ মোবাইল হ্যান্ডসেট, টিভি, কম্পিউটার, ওভেন, রেডিও, পাওয়ার লাইন, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি) হতে নির্গত হয়, সাধারণভাবে তা মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

সেবাপ্রদান ব্যবস্থায় আরো অধিকতর সমন্বয় এবং স্বচ্ছতা আসবে।

অদূর ভবিষ্যতে দেশে যখন ফাইভ-জি প্রযুক্তি চালু হবে তখন মোবাইল টাওয়ার ও সাইটের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। অথচ রেডিয়েশনের কাল্পনিক ভীতির কারণে টাওয়ার ও সাইট বসানো কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। এই পুরো ব্যাপারটার সুরাহা কীভাবে সম্ভব বলে মনে করেন?

মো. এমদাদ উল বারী: হ্যাঁ, ফাইভজি প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ হলে খুব কাছাকাছি দূরত্বে অনেক ছোট ছোট টাওয়ার স্থাপিত হবে। দেখুন, আমাদের দেশের সকল মোবাইল টাওয়ারে স্থাপিত যন্ত্রপাতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, যা পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। মোবাইল টাওয়ারে স্থাপিত এ সকল যন্ত্রপাতি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিটিআরসির অনুমোদন ও মান যাচাই সাপেক্ষে আমদানি করা হয়। মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ, যা সকল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি (যেমন: মোবাইল হ্যান্ডসেট, টিভি, কম্পিউটার, ওভেন, রেডিও, পাওয়ার লাইন, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি) হতে নির্গত হয়, সাধারণভাবে তা মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

বাংলাদেশে মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের অনুমোদিত সীমা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিকিরণের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে মানবদেহের কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই এবং পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। বিটিআরসি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দেশের সকল বিভাগের বিভিন্ন স্থানে (বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, হাসপাতাল, হাট-বাজার, আবাসিক ও জনবসতি এলাকা) স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশনের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপ করেছে এবং প্রতি বছর দেশব্যাপী এই কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত বিকিরণের মান অনুমোদিত মানদন্ডের চেয়েও অনেক কম। বিটিআরসির

এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের অনেক এলাকায় টাওয়ার স্থাপনের বাধা দূর হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত। জনগণের এই সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হলো মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা। কোন এলাকা থেকে অযাচিতভাবে মোবাইল টাওয়ার অপসারণ করা হলে বা মোবাইল টাওয়ার স্থাপনে বাধা দেওয়া হলে ওই এলাকার জনগণ একটি মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।

এজন্য সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সকল নিয়ম-কানুন মেনে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সকল পক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি। একই সঙ্গে মোবাইল টাওয়ার সম্পর্কিত ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। দেশব্যাপী আমাদের চলমান ইএমএফ রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে মোবাইল অপারেটর এবং টাওয়ার অপারেটরদের সঙ্গে যৌথ আয়োজনে আমরা সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করতে পারি।

মোবাইল শিল্প দেশের বৃহত্তম রাজস্ব প্রদানকারী খাত হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জিডিপিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে আর্থিক দিকের পাশাপাশি এই খাত একটি জাতির সার্বিক জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন বা উন্নয়নের সংগে সরাসরি জড়িত সামাজিক ও আর্থিক সংযুক্তি (ইনক্লিউশন), ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই ভূমিকা কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে মনে করেন?

মো. এমদাদ উল বারী: মোবাইল শিল্পের অগ্রগতি কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বাংলাদেশে মোবাইল শিল্পের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ব্যবসার ক্ষেত্রগুলোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

পরিসংখ্যান অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯ কোটিরও অধিক। এই বিশাল সংখ্যক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ডিজিটাল সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। তবে এই ক্ষেত্রের সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত মোবাইল শিল্পের এই অবদানকে আরও বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুতগতির এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভয়েস ও ইন্টারনেট সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এখনো বাংলাদেশের অনেক প্রান্তিক এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের মান আশানুরূপ নয়।

উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফাইভজি প্রযুক্তির প্রসার এবং নেটওয়ার্ক কভারেজ বৃদ্ধি করা। ফাইভজি প্রযুক্তির অভূতপূর্ব গতি, ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে অধিকতর ত্বরান্বিত করা সম্ভব। স্মার্ট ফ্যাক্টরি, অটোমেশন, রোবোটিক্স এবং স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দূরশিক্ষণ, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এবং অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিমেডিসিন, রিমোট সার্জারি এবং রিয়েল-টাইম রোগ

> মোবাইল শিল্প শুধু একটি টেকনোলজিকাল সেক্টর নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নীতি সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে এই খাতের আরও বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

নির্ণয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, স্বয়ংক্রিয় যানবাহন, স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, উচ্চ-মানের ভিডিও স্ট্রিমিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং বিনোদন মাধ্যমের উন্নত অভিজ্ঞতা, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল সেবার প্রসারের মাধ্যমে ফাইভজি প্রযুক্তি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

ডিজিটাল সেবা গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সকল স্তরের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে এই জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করাও অত্যন্ত জরুরি।

আর্থিক লেনদেন সহজতর করার জন্য সকলের জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিং সেবা সহজলভ্য করতে হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ, বীমা, সঞ্চয় ইত্যাদি সেবা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মোবাইল শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে মোবাইল প্রযুক্তিতে কোনো ধরণের মৌলিক গবেষণা হয়না বললেই চলে। এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের বাংলায় কন্টেন্ট তৈরি এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

মোবাইল শিল্প শুধু একটি টেকনোলজিকাল সেক্টর নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নীতি সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে এই খাতের আরও বিস্তার ঘটানো সম্ভব। বিটিআরসি, অপারেটর এবং জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এটি জাতীয় উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিবন্ধ

টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশন : টেকসই ব্যবসা ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ

লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

টেলিকমিউনিকেশন বিধিবিধান মূলত. নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত একগুচ্ছ শাসন কৌশল, নীতি, নির্দেশিকা এবং নির্দেশনা যা টেলিকমিউনিকেশন ইকোসিস্টেমের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি দেশের টেলিকম খাতকে নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্স প্রদান এবং তদারকির মূল দায়িত্ব পালন করে। একটা সময় ছিল যখন টেলিকমিউনিকেশন মূলতঃ সরকার ও সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত ছিল, ফলে সাধারণের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি অত্যন্ত সীমিত ছিল। তবে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে, বিশেষকরে ১৯৯০-এর দশকে তারবিহীন প্রযুক্তির বিকাশ সংযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধন করে এবং তা দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। আজকের দিনে একটি দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোগুলোর বিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, যেখানে স্থিতিশীল বাজার, উদ্ভাবন এবং ভোক্তা সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি শক্তিশালী, টেকসই ও সুসংগঠিত রেগুলেশন যে কোনো দেশের জন্য বিনিয়োগবান্ধব, প্রতিযোগিতামূলক এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক টেলিকম ইকোসিস্টেম গঠনের কাঠামোবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনের পথপ্রদর্শক ছিল। এই যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৪ সালে স্যামুয়েল মোরসের টেলিগ্রাফ উদ্ভাবনের মাধ্যমে। তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ প্রোটোকল মানসম্মত করতে ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (FCC) গঠন করে এবং তা রেডিও ও টেলিফোন সেবার নিয়ন্ত্রণ এবং একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থা প্রতিরোধে কাজ করে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে ইন্টারনেট ও তারবিহীন প্রযুক্তির উত্থানকালে এ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ উদারীকরণ, প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোর দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এতে নেট নিরপেক্ষতা (Net Neutrality), ডাটা গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশে প্রথম টেলিকম প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিকম নিয়ন্ত্রণের সূচনা ঘটে ২০০১ সালের বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে; প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)।

টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনের কাঠামোর মৌলিক দিকসমূহ

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পর্যবক্ষণ করলে দেখা যায়, যে কোনো নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ক্ষেত্রে দেশভেদে কিছু সাধারণ মিল রয়েছে। মূলতঃ একটি মানসম্পন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিম্নলিখিত মূল লক্ষ্যগুলোর দিকে নজর দেয়:

ক. ব্যবসার স্থায়িত্ব: এটি মূল বিষয়, কারণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে যে সমস্ত বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে-

- টেলিকম অপারেটরদের জন্য একটি টেকসই বাজার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- ডিজিটাল অবকাঠামো ও উদীয়মান প্রযুক্তিতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে।
- টেলিকম সেবা প্রদানকারীদের জন্য নিয়ন্ত্রক জটিলতা ও পরিচালনগত চ্যালেঞ্জ কমাতে হবে।

খ. গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন: পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, গ্রাহকদের জন্য সেবার মান (QoS) নিশ্চিত করতে হবে। এটি অর্জন করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়ে-

- নেটওয়ার্কের গুণমান, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- ভোক্তার অধিকার, ডাটা গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বিশেষ করে গ্রামীণ ও দূরবর্তী অঞ্চলে সর্বজনীন সংযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

গ. ডিজিটাল রূপান্তর ও উদ্ভাবন : প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে ডিজিটাল রূপান্তর নীতিমালাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে নিয়ন্ত্রককে এগিয়ে আসতে হবে, যেমন:

- ফাইভজি, ইন্টারনেট অফ থিংগস (BU), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও ক্লাউড-ভিত্তিক টেলিকম সেবার গ্রহণযোগ্যতা উৎসাহিত করা।
- ডিজিটাল স্টার্টআপ এবং টেলিকম সেবার বৈচিত্র্যকরণে সহায়তা করা।
- এমন একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ গঠন করা, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে।

ঘ. সরকারি লক্ষ্য ও নীতিমালা: সরকারের ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগ, প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রককে পরিচালিত হতে হবে। সেই সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ শিল্পের প্রবৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটি নিম্নলিখিতভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে-

- শিল্পখাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা।
- নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো, ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও ডিজিটাল অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা।

> “ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরি যাতে শিক্ষা, চাকরি এবং জরুরি সেবাগুলোর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করে। এটি ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম এবং নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে সকল নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে”

- বিনিয়োগের ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করা।

ঙ. ডিজিটাল বৈষম্য দূররীকরণ: ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরি যাতে শিক্ষা, চাকরি এবং জরুরি সেবাগুলোর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করে। এটি ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম এবং নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে সকল নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে। এজন্য যথাযথ কর্মপ্রক্রিয়া থাকা জরুরি-

- ধনী ও দরিদ্র, শহর ও গ্রাম এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে নীতিমালায় সাশ্রয়ী ইন্টারনেট
- গ্রামীণ এলাকায় ভর্তুকি ভিত্তিক টেলিকম সেবা
- লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল নীতি এবং সার্বজনীন ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীদের ডিজিটাল দক্ষতায় ক্ষমতায়ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনের কৌশল: একটি প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি

ক. স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন: স্পেকট্রাম হল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উচ্চমূল্যের স্পেকট্রাম টেলিকম ব্যবসার স্থায়িত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষকরে ফাইভজি বা ইন্টারনেট অফ থিংকসের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলোর জন্য সীমিত স্পেকট্রাম নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হলে কিছু সুসংগঠিত নিয়ন্ত্রক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, যেমন:

- কিস্তি-ভিত্তিক অর্থপ্রদান ও নমনীয় মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে ন্যায্য ও সাশ্রয়ী স্পেকট্রাম মূল্যায়ন।
- প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ লাইসেন্সিং, স্পেকট্রাম শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম ট্রেডিংয়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- এআই-চালিত স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গতিশীল স্পেকট্রাম বণ্টন।

খ. বাজার প্রতিযোগিতা ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ: সার্বিকভাবে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কম হস্তক্ষেপ ও সর্বাধিক কার্যকারিতার

> ২০১৮ সাল থেকে মোবাইল অপারেটরদের টাওয়ার স্থাপনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ফলে তারা চারটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত টাওয়ার কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যার মধ্যে মাত্র একটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর।

মাধ্যমে শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ নিশ্চিত করা জরুরি। একচেটিয়া ব্যবসার প্রবণতা রোধ করে এটি বাজার প্রতিযোগিতাকে উন্মুক্ত রাখে, যা মূল্য যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব এবং উচ্চ পরিচালন ব্যয় হ্রাস করতে পারে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যা করতে পারে-

- একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধের জন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগ করা।
- রাজস্ব ভাগাভাগির ভারসাম্যপূর্ণ মডেল প্রতিষ্ঠা করা, যা টেলিকম অপারেটর, OTT সেবা প্রদানকারী ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ন্যায্য রাজস্ব বণ্টন নিশ্চিত করবে।
- নেটওয়ার্ক শেয়ারিং নীতিমালা বাস্তবায়ন করে খরচ কমানো ও সেবার বিস্তারকে উৎসাহিত করা, ইত্যাদি।

গ. সেবার মান (QoS) **ও ভোক্তা সুরক্ষা:** নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব হলো কল ড্রপ, ধীরগতির ডাটা স্পিড এবং নেটওয়ার্ক জট সহনীয় করে গ্রাহকের সেবা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করা। এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

- টেলিযোগাযোগ সেবাকে জবাবদিহিতার আয়তায় নিয়ে আসা ও দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।
- বাস্তবসম্মত ন্যূনতম ডাটা গতি ও কল মানের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- গ্রাহক সুরক্ষার জন্য দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সাড়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন।
- সেবা প্রদানে ব্যাঘাত ঘটলে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ. ডিজিটাল রূপান্তর ও উদ্ভাবন : নিয়ন্ত্রকদের উচিত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ইন্টারনেট নিরাপত্তা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা। উদীয়মান বা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য করণীয়-

- স্থানীয় স্টার্টআপদের সহায়তা প্রদান।
- এআই-চালিত নেটওয়ার্ক, ফাইভজি এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তির পরীক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রক স্যান্ডবক্স তৈরি করা।
- ক্লাউড-ভিত্তিক টেলিকম অপারেশনকে উৎসাহিত করা।

ঙ. তথ্য সুরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল অধিকার: বর্তমানে ডিজিটাল সমাজে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হল-

- সাইবার নিরাপত্তা হুমকি, টেলিকম জালিয়াতি ও ডিজিটাল প্রতারণা বৃদ্ধি।
- তথ্য গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কঠোর নিয়মের অভাব।
- ডিজিটাল অধিকার সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সচেতনতার অভাব।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভোক্তা তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও কঠোর প্রয়োগ, নিরাপদ ডিজিটাল লেনদেন এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম চালানো প্রয়োজন।

চ. বিনিয়োগ ও আর্থিক স্থায়িত্ব: বৈদেশিক ও স্থানীয় বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও রক্ষা করা নিয়ন্ত্রকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু উচ্চকরের বোঝা, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং গ্রামীণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তার অভাব এই প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এজন্য যা করা যেতে পারে-

- বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্ট করতে নীতিমালা প্রণয়ন।
- উচ্চ কর হ্রাস করা, টেলিকম সরঞ্জামের উপর ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক হ্রাস করা।
- সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি বা কর সুবিধা প্রদান।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশন

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স হারিয়ে বা নিষ্ক্রিয় যেতে দেখেছে মূলতঃ কোম্পানিগুলোর সরকারি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) গঠনের পর প্রায় এক ডজন ফিক্সড ফোন বা পিএসটিএন (Public Switched Telephone Network) কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। তবে এসব স্থানীয়ভাবে অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেও টিকে থাকতে পারেনি। একইভাবে, দুটি ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) অপারেটর কোম্পানিও একই পরিণতির শিকার হয়। থ্রিজি চালুর পর তাদের জন্য সেবা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই দুই কোম্পানির মধ্যে একটির বিনিয়োগ ছিল স্থানীয়, আর অন্যটি বিদেশি বিনিয়োগ। আইএলডিটিএস (International Long Distance Telecommunication Services) নীতির আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনেক অপারেটরকেও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারি বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হয়।

বুঝতে হবে যে, যেকোনো সেবায় মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পরিচলন খরচ বাড়িয়ে তোলে। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় যেখানে অপারেটরগুলো স্যাটেলাইট টিভি, টাওয়ার অবকাঠামো, আইএসপি, ফাইবার সেবা এবং সাবমেরিন কেবল একত্রে পরিচালনা করতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত নয়। এটিসহ নানা বিধিনিষেধের কারণে টেলিকম খাতটি একটি জটিল ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। ফলতঃ সাপ্লাই চেইন দীর্ঘায়িত করেছে এবং নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করেছে।

সরাসরি সেবা প্রদানকারীরা প্রায়ই ব্যাকএন্ড সহায়তার অভাবে টেলিকম ইকোসিস্টেম ব্যর্থতার দায় বহন করে। যখন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় দোষ অপারেটরদের ওপর বর্তানো হয়। ২০১৮ সাল থেকে মোবাইল অপারেটরদের টাওয়ার স্থাপনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ফলে তারা চারটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত টাওয়ার কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যার মধ্যে মাত্র একটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। এর ফলে, বিগত ছয় বছর ধরে অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

আইএলডিটিএস নীতির একটি কেস স্টাডি থেকে দেখা যায় টেলিকম সেবা আইজিডব্লিউ, আইআইজি এবং আইসিএস-এ বিভক্ত করার ফলে অপ্রয়োজনীয় মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি হয়েছে। এটা দীর্ঘমেয়াদী কোনো সুবিধা তো নয়ই বরং অনেক জটিলতা বৃদ্ধি করেছে।

নমনীয় ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনের প্রয়োজনীয়তা

২০০০-এর দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্বব্যাপী টেলিকম রেগুলেশন ব্যবস্থা শিথিল করার (deregulation) প্রবণতা দেখা গেলেও বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমাগত কঠোর হয়ে উঠেছে। তদুপরি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-এর বিভিন্ন ধারা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবিধানিক রূপ পায়নি, ফলে বিটিআরসি নিয়মিত নির্দেশিকা প্রকাশ করছে যা কার্যত বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং রুল বা বিধানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিকভাবে নেওয়া হয় এবং প্রায়শই সেবা প্রদানকারীদের মতামত ছাড়াই কার্যকর করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেসব মোবাইল অপারেটর দেশব্যাপী ফাইবার-অপটিক ক্যাবল স্থাপন করেছে তারা উদ্বৃত্ত ক্ষমতা অন্যদের লিজ দিতে পারে না এবং পৃথক লাইসেন্স ও প্রশাসনিক তরঙ্গ বরাদ্দের মাধ্যমে বাজার প্রতিযোগিতা সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী, ২০০০-এর দশকের শুরুতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে "soft regulation"-এর দিকে প্রবণতা তৈরি হয় যেখানে কঠোর প্রয়োগের পরিবর্তে নির্দেশিকা ও মানদণ্ড অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (hard regulation) ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো ও নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকে কিন্তু নমনীয় নিয়ন্ত্রণ (flexible regulation) মূলত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুগত্য ও শিল্প খাত ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। তা কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ না করেও সর্বোত্তম অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

এই প্রবণতা আরও উন্নত হয়ে স্ব-নিয়ন্ত্রণের (self-regulation) দিকে গিয়েছে যেখানে শিল্প খাত নিজেই সেবার মান, নৈতিক অনুশীলন এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। স্ব-নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বৃদ্ধি করে, প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং উচ্চমানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করে।

এখন প্রশ্ন হলো, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর ভূমিকা কী হওয়া উচিত? আধুনিক রাষ্ট্রে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে সুবিধাদানকারী (facilitator) হিসেবে কাজ করা উচিত।

কিছু বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনা

যদিও এটি কোনো বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র নয় তবু কিছু বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ টেলিযোগাযোগ খাতের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য, বিশেষকরে যেখানে বিপুল বিনিয়োগ সম্পৃক্ত। মূলতঃ এটি সার্বিক ডিজিটাল রূপান্তর অর্জনে সহায়তা করবে এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নিচে কিছু পদক্ষেপ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো যেগুলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা জরুরি-

- নমনীয় স্পেকট্রাম পেমেন্ট মডেল চালু করা।
- সেবার মান (QoS) পর্যবেক্ষণ ও অবকাঠামো ভাগাভাগি সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে FDI নীতিমালা শক্তিশালী করা।
- টেলিকম কর হ্রাস করা এবং গ্রামীণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে প্রণোদনা প্রদান।
- কঠোর ডেটা গোপনীয়তা আইন প্রয়োগ ও এআই-চালিত টেলিকম অটোমেশনকে উৎসাহিত করা।
- উদ্ভাবনের জন্য নিয়ন্ত্রক স্যান্ডবক্স বাস্তবায়ন।
- গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অভিজ্ঞতার মানোন্নয়ন শক্তিশালী করা।
- ব্যবসায়িক সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফাইভজি চালু করা ও টেলিকম সাইবারসিকিউরিটি মানদণ্ড নির্ধারণ।
- ডিজিটাল অধিকার কার্যকরকরণ বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশের টেলিকম খাতের সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তর অর্জন।

পরিশেষ

আমাদের বুঝতে হবে যে একটি সুসংগঠিত নিয়ন্ত্রক রোডম্যাপ ব্যবসার স্থায়িত্ব ও ভোক্তা কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে। এমন নিয়ন্ত্রক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সহজেই বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারে এবং উন্নত সেবা মান ও সাশ্রয়ী মূল্যের মাধ্যমে ভোক্তাদের একটি প্রতিযোগিতামূলক টেলিকম ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারে। তদুপরি এটি পূর্ণাঙ্গ সাইবারসিকিউরিটি ও ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সর্বাধুনিক উদ্ভাবন সক্ষম করে ডিজিটাল রূপান্তরকে সমর্থন করবে। একটি আধুনিক, বাজারকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি বাংলাদেশকে ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, যা উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা ও জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

নিবন্ধ

ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এখন সময়ের দাবি

তাইমুর রহমান
চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার,
বাংলালিংক

জুলাই বিপ্লবের সময় যখন অস্থির অবস্থা তখন স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বাংলাদেশে বেশ কয়েকদিন ধরে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়। জনজীবন, শিল্প ও সেবা খাতের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্ত।

বছরের জুলাই মাসে টানা প্রায় ১০ দিন জনপ্রিয় অ্যাপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ মোবাইল ইন্টারনেট সেবা স্থগিত রাখা হয়। ইন্টারনেট সেবা বন্ধ থাকার কারণে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় স্থবির হয়ে যায়। এ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কিত আইন নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে এমন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে সারা বিশ্ব ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট সমর্থিত অন্যান্য ডিজিটাল সেবার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করতে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; বিশ্বজুড়ে ব্যবসা ও শিল্পের প্রসারে প্রতিনিয়ত রাখছে সহায়ক ভূমিকা। এমন পরিস্থিতি বা যুগে ইন্টারনেট ও অবাধ যোগাযোগের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

এমন বাস্তবতার বিপরীতে বাংলাদেশ বেশ কয়েকদিন ধরে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখে; যা জনজীবন, শিল্পখাত ও সেবা খাতের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

অথচ এমন সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী সরকারের ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের পরিপন্থী ছিল। ব্ল্যাকআউটের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়; ফলে স্থানীয় অর্থনীতি কঠিন সংকটের মুখোমুখি হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমান, ব্ল্যাকআউটের কারণে এই খাতের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৮,০০০ কোটি টাকা।

এই আকস্মিক ব্ল্যাকআউটের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় এ দেশের ভাবমূর্তির। বিগত সরকারের এমন খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে।

বিশেষ করে, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) খাত এই ব্ল্যাকআউটের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের ভাবমূর্তির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, কারণ অনেক ফ্রিল্যান্সার বৈশ্বিক ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সময়মতো সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া কোনোরকম পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ক্লায়েন্টদের আপডেট দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিক্ষোভ দমন করার লক্ষ্যে এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়; এমন খবর প্রায় সকল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞরা এটিকে মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন।

অনেকে অবশ্য ইন্টারনেটকে মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করার পক্ষে নয়; এর পক্ষে বিপক্ষে মতামত থাকতে পারে। তবে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সবজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) ইন্টারনেট অ্যাক্সেসকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

'দ্য প্রোমোশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড এনজয়মেন্ট অব হিউম্যান রাইটস অন দ্য ইন্টারনেট' (ধারা ৩২) শিরোনামের আরেকটি বিধির মাধ্যমে এই রেজ্যুলুশনটি আরও স্পষ্ট করা হয়। এতে মানবাধিকার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর মূল ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইন্টারনেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই সর্বজনীন ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে ইন্টারনেট প্রাপ্তিকে (অ্যাক্সেস) একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০০৯ সালে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ আদালত 'কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিল' ঘোষণা করে যে, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে; এ সময়, নির্বিচারে নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

এমনকি বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশের রাজ্য কেরালার হাইকোর্ট ২০১৯ সালে এক রায়ে উল্লেখ করে যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের অধিকার শিক্ষা ও গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারের অংশ।

বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সহায়ক হবে এমন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা বিদেশি বিনিয়োগকারী ও টেলিকম অপারেটরদের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নেতিবাচক বার্তা পাঠিয়েছে।

> বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) খাত এই ব্ল্যাকআউটের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের ভাবমূর্তির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, কারণ অনেক ফ্রিল্যান্সার বৈশ্বিক ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সময়মতো সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়।

বিশেষ করে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেসকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তখন ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ায় তারা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও স্থানীয় অংশীদারদের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

অনেকের মতে, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের পেছনে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা (আইএসপি) ভূমিকা রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেট সেবার ভ্যালু চেইনে একাধিক অংশীদার রয়েছে। মূল সমস্যা হলো, এ সমস্ত সরবরাহকারীরা সবাই অত্যন্ত কঠোর টেলিকম আইন ও সুনির্দিষ্ট লাইসেন্স বিধানের আওতায় পরিচালিত হয়। ফলে সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অনেক বেশি ক্ষমতা উপভোগ করে থাকে এবং কোনো প্রকার প্রতিরোধ/বাধা ছাড়াই লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেকোনো নির্দেশ পালন করতে বাধ্য করে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১-এর ধারা ৬৬ (ক), ৯৭ (২) ও ৯৭এ এবং ইউনিফাইড লাইসেন্সের ধারা ২৬.০৩.০১ অনুযায়ী, টেলিকম অপারেটররা জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য।

অন্যথায় ধারা ৬৬এ এবং ৭৩-এর সাথে ৭৬-এর পাঠ অনুযায়ী, এসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের কর্মকর্তারা আইন অমান্য করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; এবং এতে করে তাদের ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং/অথবা লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।

এধরনের একতরফা ক্ষমতা প্রদানকারী আইন কেবল ইন্টারনেট নয়, বরং টেলিযোগাযোগ-নির্ভর অন্যান্য সেবার ওপরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সুযোগ করে দিতে পারে। তাই এ আইনগুলো দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ যখন বিভিন্ন খাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা আশা করি যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদার আগামীতে সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। দায়িত্বশীল বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বচ্ছতা, সুশাসন ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে কাজ করবেন, যা ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

নিবন্ধ

ডিজিটাল অগ্রযাত্রার অনন্য সহযোগী টেলিযোগাযোগ শিল্প: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

তানভীর মোহাম্মদ

চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন

নব্বইয়ের দশকে দেশের মানুষের হাতে এলো এক অভিনব প্রযুক্তি - মোবাইল ফোন। শুরুটা ছিল শুধু কথা বলা দিয়ে, বাড়তি পাওনা শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস)। এরপর টিঅ্যান্ডটি থেকে কল রিসিভ করার সুযোগ এবং কল করার সুযোগ- এটাও যেন ছিল এক অনন্য প্রাপ্তি। কিন্তু গত দুই দশকে চিত্রটা আমুল পাল্টে গেছে। মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রে আর সীমাবদ্ধ রইল না। হয়ে উঠলো শিক্ষা, বিনোদন, খেলা, তথ্য সংগ্রহ, ডিজিটাল সেবা গ্রহণের অন্যতম হাতিয়ার। আর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল জীবনধারার প্রসারে এবং যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জনে অন্যতম সহযোগী হয়ে উঠল টেলিযোগাযোগ শিল্প।

লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জ যেখানে এবং করণীয়

ডিজিটাল সমাজ ও জীবনযাপনের মূল অনুষঙ্গই হল মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট। কিন্তু দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে। অন্যদিকে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশের একটু বেশি। তাই স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ানোই এখন মূল চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়:

প্রথমত, ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে হবে, দেশের সকল মানুষকে কার্যকর

ও নিরাপদ ডিজিটাল সেবার আওতায় আনতে হবে। সেই উদ্দেশ্য থেকেই দেশের ৩০ লাখ প্রান্তিক নারী ও তরুণ-তরুণীর ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করেছে টেলিনর, গ্রামীণফোন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল। ইউনিসেফ বাংলাদেশ, গ্রামীণফোন ও টেলিনরের এক যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তির নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষা পাচ্ছে বাংলাদেশের এক কোটির বেশি শিশু। নারীরা যাতে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল বিশ্বের সম্ভাবনা উন্মোচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন করতে পারেন এজন্য 'ইন্টারনেট এর দুনিয়া সবার' নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গ্রামীণফোন, যা বাংলাদেশের ২০০০ ইউনিয়নে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন করেছে।

দ্বিতীয়ত, উপযোগী, ইতিবাচক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন কনটেন্টের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, দৈনন্দিন কেনাকাটা, আর্থিক লেনদেন, কৃষি, অফিস-কলকারখানা ব্যবস্থাপনা- সব জায়গায় ডেটার ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তাই ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে ডিজিটাল জীবনধারা বিস্তারের পাশাপাশি নিত্য ব্যবহার উপযোগী কনটেন্ট নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, সহজলভ্য ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: সরকারি অনেক সেবাই কিন্তু এখন অনলাইনে পাওয়া যায়, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন ছাড়াও বিল পরিশোধ ও সঞ্চয়ের মতো সেবা নেয়া যায়, রোমিং সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের বাইরে গিয়েও নিশ্চিতে সংযুক্ত থাকা যায়। কিন্তু এই সেবাগুলো সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা নেই। তাই আমাদের দেশে প্রচলিত যে ডিজিটাল সেবাগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

চতুর্থত, সহজলভ্য হলেও আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে অনেকের জন্যই এখনও একটি স্মার্টফোন কেনা কষ্টসাধ্য। তাই আরো সাশ্রয়ী মূল্যে যেন গ্রাহকরা স্মার্টফোন কিনতে পারেন এজন্য কর কাঠামোয় পরিবর্তন আনা এবং উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা জরুরি। স্মার্ট ডিভাইসের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন অপারেটর, আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান ও হ্যান্ডসেট কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চমত, অনলাইনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ডিজিটাল জীবনধারা প্রসারের সাথে সাথে অনলাইনের ওপর আমাদের নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। বেড়েছে ক্লাউডভিত্তিক সেবা ও অ্যাপের ব্যবহার। অন্যদিকে সাইবার অপরাধীরাও বিভিন্ন কৌশলে হ্যাকিং, সাইবার হামলা বা প্রতারণা করছে। তাই নিরাপদ অনলাইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে সামগ্রিক ও ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ইউনিফাইড লাইসেন্স:

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সম্প্রতি ইউনিফাইড লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু করেছে। এই লাইসেন্স ডিজিটাল অগ্রগতির পথকে সুগম করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাত আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে। উন্নত সেবা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকৃত হবেন গ্রাহকরা। যেমন: আগে আমরা ৯টি সেবা দিতে পারতাম। এখন ১৪টি'র মতো সেবা দেয়া যাবে। নতুন সেবাগুলো হচ্ছে: আইওটি, ক্লাউড, অ্যানালিটিকস, এআই, ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাকসেস ইত্যাদি। এছাড়া এই ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা অনেক সহজ হয়েছে। লাইসেন্সিং নীতিমালায় সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের সুরক্ষায় অত্যন্ত সময়োপযোগী। এখন থেকে পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ দুই বছরের অডিট হবে যা একটি বিনিয়োগ-বান্ধব সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ভবিষ্যতের প্রযুক্তি

দেশের টেকসই অগ্রযাত্রা নিশ্চিতে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিকে আমাদের যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেমনই একটি বহুল চর্চিত প্রযুক্তি ফাইভজি, যা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে বেশ আগ্রহ আছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে এই প্রযুক্তির সাফল্য নির্ভর করবে এর উপযুক্ত প্রয়োগের ওপর। ব্যক্তি পর্যায়ের চাহিদা পূরণে আসলে ফোরজিই যথেষ্ট। ফাইভজি প্রযুক্তিটা মূলত উৎপাদনমুখী শিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, এয়ারপোর্ট, স্টেশন ও বন্দর ব্যবস্থাপনার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের জন্য বেশি উপযোগী। ইউনিফাইড লাইসেন্স পাওয়ার পর এখন এ ব্যাপারটি সামনে এসেছে যে আমরা কবে ফাইভজি সেবা চালু করবো। সেবাটি চালুর জন্য আমরা ফাইবারাইজেশন

ও নেটওয়ার্ক সরঞ্জামের আধুনিকীকরণ করছি। তবে ফাইভজির পুরোপুরি বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালুর বিষয়টি নির্ভর করবে সামগ্রিক ইকোসিস্টেম ও উপযোগিতার ওপর।

গ্রাহকের হাতেই অগ্রযাত্রার স্মারক

মোবাইল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবন ধারায় এসেছে আমুল পরিবর্তন। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা এবং ডিজিটাল বিনোদনের ধারায় এ পরিবর্তন লক্ষণীয়। করোনাকালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, চালু হয়েছে হোম অফিসের ধারণা। চিকিৎসাক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার। শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে নানা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

মোবাইল ইন্টারনেটের কল্যাণে আমুল পাল্টে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। এর অনন্য উদাহরণ 'ইউটিউব ভিলেজ'। কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার প্রত্যন্ত শিমুলিয়া গ্রামটি এখন এই নামেই সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে। গ্রামটির প্রায় শতভাগ তরুণ-তরুণীর ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। তাদের প্রতিদিনের আপলোড করা কন্টেন্ট দেখছেন সারাবিশ্বের লাখ লাখ মানুষ। দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে এখন টাঙ্গাইলের মধুপুরের বাসিন্দারাও ঘরে বসে করছেন ইউরোপ-আমেরিকার কাজ। ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে অনেকেই অনলাইনে কিনছেন কোরবানির পশু। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগানের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ আম এখন অনলাইনে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

ইন্টারনেট সংযোগের কল্যাণে দেশের অনেক নারীই এখন অনলাইনে পণ্য বিক্রি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। আবার অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের করে তুলতে পারছেন আরো দক্ষ ও অগ্রগামী। আর এভাবেই বদলে যাচ্ছে দেশ, এগিয়ে চলেছে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে।

টেলকো-টেক হওয়ার পথে গ্রামীণফোন

দেশে বৈশ্বিক মানের ডিজিটাল পণ্য ও সেবা চালু করতে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে গ্রামীণফোন। এরই ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফোন অপারেটর থেকে টেলকো-টেক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এরই মধ্যে বেশ কিছু অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সেবা চালু করা হয়েছে। সিলেটে ডাটা সেন্টার স্থাপনের ফলে গ্রাহকরা আরো মানসম্পন্ন সেবা এবং উচ্চ গতির ইন্টারনেট উপভোগ করতে পারবেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সেন্টারটির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দেয়া সম্ভব হবে। গ্রাহকদের ডিজিটাল জীবনধারার চাহিদা পূরণে বাড়ি, অফিস, যানবাহন, স্বাস্থ্য, কৃষি, শহরসহ নানা খাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা এনেছি নতুন আইওটি প্রোডাক্ট লাইন ও অ্যাপ- আলো। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণফোন এখন গ্রাহকদের নেটওয়ার্ক ব্যবহারের চাহিদা সম্পর্কে পূর্বাভাস পেতে পারে। ফলে নেটওয়ার্ককে গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি রাখা সম্ভব হয়।এছাড়াও গত বছর আমরা নিয়ে এসেছি বাংলাদেশের প্রথম ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস সার্ভিস 'জিপিফাই আনলিমিটেড'। দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

অন্তর্ভূক্তিমূলক ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য পার্টনারশিপের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অনলাইন নিরাপত্তার ওপর নারী, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। জিপি একাডেমির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজ করেছে গ্রামীণফোন। তারা যেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবসহ পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন এজন্যই এই উদ্যোগ। অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে রয়েছে জিপি এক্সিলারেটর। দেশের সকল অঞ্চলের মেধাবী ডিজিটাল উদ্যোক্তারা যেন এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এজন্য গ্রামীণফোন 'জেলায় জেলায় স্মার্ট উদ্যোক্তা'বুটক্যাম্পের আয়োজন করেছে।

> আরো সাশ্রয়ী মূল্যে যেন গ্রাহকরা স্মার্টফোন কিনতে পারেন এজন্য কর কাঠামোয় পরিবর্তন আনা এবং উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা জরুরি। স্মার্ট ডিভাইসের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন অপারেটর, আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান ও হ্যান্ডসেট কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

টেকসই জ্বালানি, টেকসই অগ্রগতি

২০৩০ সাল নাগাদ কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে গ্রামীণফোনের। এ লক্ষ্যে কর্পোরেট পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট'র (সিপিপিএ) জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণে আমরা বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনা অব্যহত রেখেছি। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সিপিপিএ বিষয়ক নীতিমালা হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়বে। অন্যদিকে ২০২৩ সালে গ্রামীণফোন ৫০৬ গিগাওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে, যা জাতীয় গ্রিডের প্রায় শূন্য দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ। গ্রামীণফোনের প্রায় ২১,৫০০ টাওয়ারের মধ্যে ১০১৪ টাওয়ারে সোলার প্যানেল আছে। সেগুলো নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়াতে চায় গ্রামীণফোন।

পরিশেষ

যে কোন লক্ষ্য অর্জনে বাধা-বিপত্তি, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ থাকবেই। এগুলো অগ্রযাত্রারই অনুষঙ্গ। ল্যান্ড ফোনের যুগ থেকে আমরা যেমন শুরু করেছিলাম মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবার, তেমনি আজকের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল জীবনধারার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে আমরা পৌঁছে যাব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায়- এই আমাদের প্রত্যাশা।

ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ এবং ৫জি প্রযুক্তির মাধ্যমে তা অতিক্রম করার উপায়

আব্দুস সালাম
কান্ট্রি ম্যানেজার, এরিকসন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এক তাৎপর্যপূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। গত এক দশকে দেশ শাসন, শিক্ষা এবং অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে এই ডিজিটাল যুগে আরও এগিয়ে যেতে ফাইভজি প্রযুক্তি এমন এক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যা সবকিছুকে আরও উচ্চধাপে নিয়ে যেতে পারে। যদিও এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা বাকি। ফাইভজি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নততর জনসেবা এবং বৃহত্তর সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য অসাধারণ সব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম।

দেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সহায়ক ইকোসিস্টেম তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহায়ক নীতিমালা, প্রণোদনা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই হবে ফাইভজি-এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর মূল চাবিকাঠি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফাইভজি সমর্থিত ডিভাইসের জন্য কর রেয়াতের মতো কর প্রণোদনার ব্যবস্থা করা গেলে তা একদিকে ব্যবসা এবং পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আর্থিক প্রতিবন্ধকতাগুলো হ্রাস করবে। এই কর রেয়াত ফাইভজি-সক্ষম ডিভাইসের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাকে নিশ্চিত করবে, উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে এবং প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

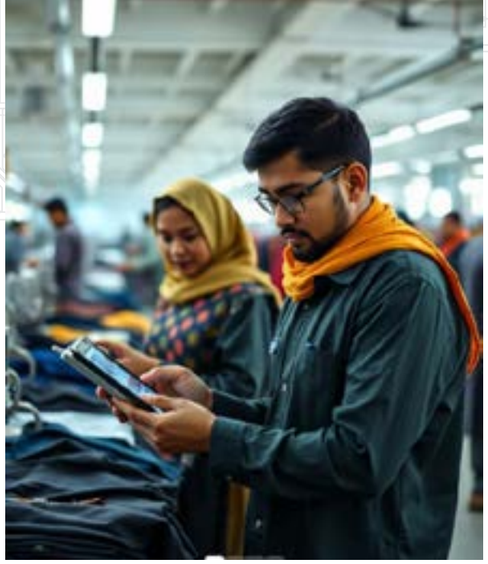

> দেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সহায়ক ইকোসিস্টেম তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহায়ক নীতিমালা, প্রণোদনা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই হবে ফাইভজি—এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর মূল চাবিকাঠি।

করবে। ফলে তা সংযুক্ত এবং গতিশীল ডিজিটাল অর্থনীতির পথ সুগম করবে।

ফাইভজির সম্ভাবনা বিশাল। এটি সুপার-ফাস্ট বা অত্যন্ত দ্রুত গতির ইন্টারনেট প্রদানে সক্ষম। এতে ল্যাটেন্সি বা ল্যাগ একেবারেই কম হয় এবং একসাথে অসংখ্য ডিভাইস সংযোগ করতে পারে। ফলে তা শিল্পখাতে উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করে এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। বর্তমানে ফিনটেক, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল সেবার মতো খাতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, কিন্তু ফাইভজি-এর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রগুলো আরও প্রসারিত এবং উন্নত হতে পারে।

ফাইভজি-এর মাধ্যমে ব্যবসা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ব্লকচেইন এবং বিগ ডেটার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা খাত তৈরি করবে। পাশাপাশি স্টার্টআপ বা নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনের সীমানা প্রসারিত করবে এবং গ্রাহকদের জন্য উন্নততর ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রদান করবে ও নতুন বাজার সৃষ্টি করবে। ফলে বাংলাদেশকে একটি উদীয়মান প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত করবে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করবে। সময়ের সাথে সাথে, এই পরিবর্তন দেশটিকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, চাকরির বাজার প্রসারিত করবে এবং কৃষি ও টেক্সটাইলের মতো ঐতিহ্যবাহী খাতগুলোর ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।

কৃষি খাতের ক্ষেত্রে বলা যায়, ফাইভজি এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিশাল প্রভাব ফেলতে সক্ষম। ফাইভজি-সক্ষম স্মার্ট ফার্মিং ডিভাইজের মাধ্যমে কৃষকরা বাস্তবসময়ের ডেটা ব্যবহার করে মাটির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, ফসলের বৃদ্ধি পরিমাপ এবং পানি ও সারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এই ধরণের নির্ভুল কৃষি পদ্ধতি উচ্চতর ফলন, কম অপচয় এবং আরও টেকসই কৃষি চর্চার পথ দেখাবে। গ্রামীণ জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করলে এই উন্নতিগুলো খাতটির জন্য যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে।

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত হলো ম্যানুফেকচারিং বা শিল্প উৎপাদন। ফাইভজি-এর মাধ্যমে, কারখানায় উন্নত রোবোটিক্স এবং অটোমেশন চালু করা সম্ভব যার মাধ্যমে কারখানার কাজকর্মকে তাৎক্ষণিকভাবে (রিয়েল-টাইম) পর্যবেক্ষণ করা যায়। ফলে আরও দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। এটি কেবল উৎপাদনের খরচ হ্রাস করবে না বরং বাংলাদেশকে বৈশ্বিক মঞ্চে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। ফাইভজি পরিচালিত ও প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্সের মাধ্যমে সরঞ্জামাদির সমস্যা বড় আকার ধারণ করার আগেই চিহ্নিত করা সম্ভব যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঝামেলাহীন রাখতে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাইরেও ডিজিটাল বিভাজন কমানোর ক্ষেত্রে ফাইভজি প্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দেশে যেহেতু সংযুক্তি বৃদ্ধির আরও সম্ভাবনা রয়েছে। ঢাকা শহরের মতো বড় শহরাঞ্চলে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও গ্রামীণ এলাকাগুলো এখনও পিছিয়ে রয়েছে। অনেক স্থানে এখনও নির্ভরযোগ্য সংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিভাজন শিক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে উপায় সীমিত করে। কিন্তু ফাইভজি প্রযুক্তি গ্রামীণ এলাকাগুলোতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করতে সক্ষম যা এই বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে।

বিশেষকরে শিক্ষা খাতে ফাইভজির প্রভাব বিশাল। অনলাইন শিক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাইভজি ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলোকে আরও আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেক্টিভ করে তুলবে। গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা শহরের শিক্ষার্থীদের মতো একই শিক্ষাসামগ্রীতে প্রবেশাধিকার পাবে, যা শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে। তাছাড়া, ফাইভজি-চালিত ভার্চুয়াল ক্লাসরুমগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম যা শিক্ষাকে সবার জন্য আরও সহজলভ্য করে তুলবে।

বাংলাদেশের নগরায়ণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় ফাইভজি স্মার্ট সিটি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কল্পনা করুন এমন একটি স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম যা যানজট কমাবে, বায়ুর গুণমান উন্নত করবে এবং চলাচল আরও সহজ করবে। শহরের বিভিন্ন স্থানে সেন্সর বসিয়ে বায়ুর মান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শক্তি ব্যবহারের মতো বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তা শহরগুলোকে আরও দক্ষ এবং টেকসই করে তুলবে। এই স্মার্ট সিটির ধারণা বাংলাদেশকে বাসযোগ্য এবং টেকসই নগর অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে সামনে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ফাইভজি চালু করতে অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন, যেমন ফাইবার-অপটিক নেটওয়ার্ক এবং ডেটা সেন্টার, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ডিজিটাল সেবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এই বাধাগুলো অপসারণ ছাড়া ফাইভজি-এর সুবিধাগুলো কেবল শহরেই সীমাবদ্ধ থাকতে থাকবে। ফলে তা ডিজিটাল বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করবে।

> বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। তাই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার প্রতিও যথাযথ ধ্যান দেওয়া জরুরি। বিদ্যমান বা পুরোনো আইনি কাঠামো ফাইভজি এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তাও একটি বড় উদ্বেগ। ডিজিটাল সেবা যত বৃদ্ধি পাবে সঙ্গে সঙ্গে সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। জনগণের ডেটা নিরাপদ রাখতে এবং এই নতুন সিস্টেমগুলোর প্রতি জনসাধারণের আস্থা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে আরও শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে হবে। তবে আশার কথা, ফাইভজি প্রযুক্তিগত কারণেই কিছু সমাধান প্রদান করে, যেমন রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং উন্নত এনক্রিপশন ব্যবস্থা। তবে এই প্রযুক্তি চালু করার সময় সাইবার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। তাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিও যথাযথ ধ্যান দেওয়া জরুরি। বিদ্যমান বা পুরোনো আইনি কাঠামো ফাইভজি এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নীতিনির্ধারকদের এমন নমনীয় এবং ভবিষ্যতমুখী বিধি তৈরি করতে হবে যা প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মানুষের অধিকার এবং গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

এত বাধা সত্ত্বেও ফাইভজি-এর সম্ভাবনা অস্বীকার করার মতো নয়। অবকাঠামো, সাইবার নিরাপত্তা এবং হালনাগাদ নিয়মকানুন ইত্যাদিতে যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক নতুন স্তরের অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। ফাইভজি-এর সুবিধা যেন শুধুমাত্র বড় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা সবার জন্য সহজলভ্য হয় সেজন্য সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে ফাইভজি বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবে। ডিজিটাল অর্থনীতি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের মতো খাতগুলোর বিপ্লব এবং শিক্ষা ও নগর জীবনের উন্নতি পর্যন্ত এই প্রযুক্তি দেশের ভবিষ্যতকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে। সহায়ক নীতিমালা, যেমন ফাইভজি-সক্ষম ডিভাইসের ওপর কর রেয়াত, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ফাইভজি ব্যবহার করে নাগরিকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলা সম্ভব।

গবেষণা প্রতিবেদন

দ্য স্টেট অব মোবাইল ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ২০২৪

বাংলাদেশে শহরের ৪১ শতাংশ এবং গ্রামের ২৬ শতাংশ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করে

মোবাইলফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশ্বিক সংগঠন গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশনস অ্যাসোসিয়েশন (জিএসএমএ) চলতি বছরের অক্টোবরে 'দ্য স্টেট অব মোবাইল ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিম্নমধ্যম আয়ের ১২টি দেশের মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে করা জরিপের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। জরিপে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোর জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপ করা হয়েছে। ভারত ও ইথিওপিয়া ছাড়া প্রতিটি দেশের ১ হাজার মানুষের ওপর জরিপ করা হয়েছে, যাদের বয়স ১৮ থেকে বেশি। জিএসএমএ-এর প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ এই নিবন্ধে তুলে আনা হয়েছে।

মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম, দরিদ্র হ্রাস করতে পারে, সংকটের প্রভাব কমাতে পারে এবং মানুষের জীবন মানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহায়ক তথ্য এবং সেবার গ্রহণের পথকে প্রশস্ত করে। মোবাইলের মাধ্যমে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অর্থনৈতিক প্রভাবও গভীর। এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ব্যবহারের গ্যাপ কমানোর মাধ্যমে ২০২৩-২০৩০ সময়কালে মোট ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অতিরিক্ত জিডিপি যোগ হবে। শুধুমাত্র ২০৩০ সালেই অতিরিক্ত ৯০০ বিলিয়ন ডলার জিডিপি যোগ করা সম্ভব।

মোবাইল ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস না থাকায়, যারা সংযুক্ত নয়, যাদের মধ্যে দরিদ্র, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী এবং নারীরা বেশি - তারা জীবন-উন্নয়নমূলক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া, জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য ঝাঁকুনির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাঘাতের সাথে মানিয়ে নিতে তারা কম সক্ষম।

জরিপের আওতাভুক্ত দেশগুলোতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৮৭ শতাংশ এবং ৭৭ শতাংশ মানুষের নিজের মোবাইল ফোন আছে, ইন্টারনেট নিয়ে সচেতনতা আছে যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ ও ৭৬ শতাংশ, মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৪৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হার কম - শহরাঞ্চলে ৮০ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৭৪ শতাংশ জনগোষ্ঠীর নিজের মোবাইল ফোন আছে। শহরে ৮১ শতাংশ ও গ্রামের ৭২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সচেতন তবে ব্যবহার ক্রে শুরে ৪৩ শতাংশ এবং গ্রামে ২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে শহরের ৪১ শতাংশ এবং গ্রামের ২৬ শতাংশ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে মিসর, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, গুয়াতেমালা ও মেক্সিকো এগিয়ে রয়েছে। ইথিওপিয়া ও উগান্ডা শুধু বাংলাদেশের পেছনে আছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে মোবাইল স্মার্টফোনের স্মার্টফোনের মালিকানার হার ছিল ৩৭ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল ২৭ শতাংশ। ২০২২ ও ২০২৩ সালে বাংলাদেশের তুলনায় পার্শ্ববর্তী ভারত ও পাকিস্তানে এই বৃদ্ধির হার বেশি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে গত এক দশকে মোবাইল ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়লেও গত ৬ মাসে এই প্রবৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের হিসাব মতে, গত ছয় মাসে (জুন ২০২৪- নভেম্বর ২০২৪) মোবাইলফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭৩ কমে এখন হয়েছে প্রায় ১৮৮ মিলিয়ন এবং মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৩ লাখ কমে এখন হয়েছে ১৩২.৮০ মিলিয়ন। মোবাইল শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং এই খাততে কর বৃদ্ধির কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে, অর্থবহ সংযোগের পথে এগোতে হলে সকল অংশীদারদের মৌলিক অঙ্গীকারের পরিবর্তন প্রয়োজন। মোবাইল ইন্টারনেটের সুবিধা উপভোগ করতে পারে এমন ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য সমাজের সকল ক্ষেত্র থেকে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণ এবং তা ব্যবহারে বাধা দূর করার জন্য সরকার, মোবাইল অপারেটর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এর মধ্যে শুধু সংযোগের প্রযুক্তিগত দিক নয় বরং ব্যবহারের গ্যাপ তৈরির পেছনে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবিলার কৌশলও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

> বাংলাদেশে গত এক দশকে মোবাইল ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়লেও গত ৬ মাসে এই প্রবৃদ্ধির হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের হিসাব মতে, গত ছয় মাসে (জুন ২০২৪— নভেম্বর ২০২৪) মোবাইলফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭৩ কমে এখন হয়েছে প্রায় ১৮৮ মিলিয়ন এবং মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৩ লাখ কমে এখন হয়েছে ১৩২.৮০ মিলিয়ন।

জরিপে উঠে এসেছে, বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ বা ৪.৬ বিলিয়ন (৪৬০ কোটি) মানুষ তাদের নিজস্ব ডিভাইসে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তবে, ২০২৩ সালে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের বৃদ্ধির হার স্থির ছিল। ২০২৩ সালে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬০ মিলিয়ন, যা আগের বছরের প্রায় সমান। তবে ২০১৫২০২১ সালে যে গতিতে ব্যবহারকারীর সংখা যে গতিতে বেড়েছে তার তুলনায় তুলনায় এই প্রবৃদ্ধির হার কম। তখন প্রতি বছর ২০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মোবাইল ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হচ্ছিল। এই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বাস করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের বৃদ্ধির হার স্থির রয়ে গেছে এবং উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল বিভাজন এখনও বিদ্যমান। যারা ডিজিটালভাবে বাদ পড়েছেন, তারা সাধারণত দরিদ্র, কম শিক্ষিত, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী এবং নারী এমন গোষ্ঠী যারা সংযোগ থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে। ডিজিটাল বিভাজন কমানোর জন্য নতুন প্রচেষ্টা ছাড়া, এই অবহেলিত গোষ্ঠীগুলো একটি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিশ্বে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ডিজিটাল বিভাজন দূর করা উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করে এবং এটি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল ইন্টারনেট আরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ই-কমার্স এবং আর্থিক সেবাসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবার সাথে সংযুক্ত করছে এবং আয়ের সুযোগ প্রদান করছে। তবে সংযোগের সুবিধাগুলো সমানভাবে উপভোগ করা হচ্ছে না।

জরিপকৃত দেশের সকল উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা আগে মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে শুনেছেন কি না। যারা শুনেছেন, তাদের আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকগুলো তাদের মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণে (যদি তারা এটি ব্যবহার না করে) বা আরও বেশি ব্যবহার করতে বাধা সৃষ্টি করে

কি না। পাশাপাশি তাদের আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা কোন প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং কোনটি এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণ এবং ব্যবহারের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতনতা, ব্যয় (হ্যান্ডসেট এবং ডেটার), সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উদ্বেগ, এবং সংযোগের অভিজ্ঞতা।

জিএসএমএ বলছে-- বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী মোবাইল ব্রডব্যান্ডের আওতায় রয়েছে। আর মোবাইল ব্রডব্যান্ড কভারেজের বাইরে থাকা ৪ শতাংশের সংখ্যা প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন। তবে কিছু দেশে এই কভারেজ গ্যাপ আরও বেশি। ৩১টি দেশে জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি এখনও কভারেজের বাইরে। কাভারেজ নেই এমন এলাকাগুলো প্রধানত গ্রামীণ, দরিদ্র এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ। এগুলো সাধারণত স্বল্পোন্নত, ভূমিবেষ্টিত উন্নয়নশীলবা ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায়।

মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার না করা প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এমন এলাকায় বাস করে যা মোবাইল ব্রডব্যান্ডের আওতায় রয়েছে। ২০২৩ সালের শেষে ৩.১ বিলিয়ন মানুষ (বিশ্বের জনসংখ্যার ৩৯%) মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় থাকা সত্ত্বেও এটি ব্যবহার করে না। মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় এই ব্যবহারের গ্যাপ ক্রমাগত কমছে। তবে, ব্যবহারের গ্যাপ এখন কভারেজ গ্যাপের তুলনায় নয় গুণ বড়। যারা মোবাইল ব্রডব্যান্ড কভারেজ থাকা সত্ত্বেও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন না, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও কোনো ধরনের মোবাইল ফোনের মালিক নন।

প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের হার শহরে ৪৩ ও গ্রামে ২৭ শতাংশ। তবে প্রতিদিন শহরের ৪০ শতাংশ ও গ্রামের ২৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ইন্টারনেট ব্যবহারেও শুধু ইথিওপিয়া বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে। তবে উগান্ডার গ্রামে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বাংলাদেশের চেয়ে কম, আবার শহরে বেশি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে জানেন; কিন্তু ব্যবহার করেন না।

বাংলাদেশে গত পাঁচ বছরে মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ মানুষের। ২০১৯ সালে ৭২ শতাংশ মানুষ মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে জানতেন। তা ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৫ শতাংশে।

সংযোগের মাত্রা অঞ্চল ও দেশের মধ্যে এবং অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার না করা ৯৫% মানুষ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বাস করে। আগের বছরের মতো, সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলটি এখনও সবচেয়ে বড় কভারেজ এবং ব্যবহারের গ্যাপ রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার প্রাপ্তবয়স্করা শহুরে এলাকার মানুষের তুলনায় মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ২৮% কম সম্ভাবনাময়, এবং নারীরা পুরুষদের তুলনায় মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ১৫% কম সম্ভাবনাময়।

২০২৩ সালের শেষে নিজের স্মার্টফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন (বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৩%)-এ পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকদের প্রায় ৮০% এখন ৪জি বা ৫জি স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে - যা ২০২২ এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৩৩০ মিলিয়ন মানুষের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। যদিও এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকদের প্রতি পাঁচজনের একজন এখনও থ্রিজি স্মার্টফোন বা ফিচার ফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছে।

২০২৩ সালে আরও ৭৩০ মিলিয়ন ব্যক্তি এমন ডিভাইসে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন যা তাদের নিজস্ব নয় বা যার উপর তাদের প্রধান ব্যবহার নেই। এর মধ্যে ৪৪০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২৯০ মিলিয়ন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে। অনেক শিশুর জন্য শেয়ার করা বা অন্য কারও ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আরও সীমাবদ্ধ। কেবল অস্থায়ী, শেয়ার করা বা অনিয়মিত অ্যাক্সেস থাকলে প্রাপ্তবয়স্করা মোবাইল ইন্টারনেটের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে অক্ষম।

প্রতিবেদন বলছে, ফোরজি কভারেজ থ্রিজি স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তবে নেটওয়ার্ক বিনিয়োগের বেশিরভাগ অংশ এখনও ফাইভজি স্থাপনে কেন্দ্রীভূত। ২০২৩ সালের শেষে বিশ্বব্যাপী ফাইভজি সংযোগের সংখ্যা ১.৫ বিলিয়নেরও বেশি হয়েছে। তবে ১০০টিরও বেশি দেশে এখনও ফাইভজি নেটওয়ার্ক চালু হয়নি, যার ৮০%-এর বেশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে অবস্থিত। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে নেটওয়ার্কের গুণমান এবং ডেটা ব্যবহারের পরিমাণ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি দেখেছে, তবে উচ্চ আয়ের অঞ্চলের তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। আরও বেশি ভোক্তা ৪জি এবং ৫জি-তে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে, ব্যবহারকারীর প্রতি গড় ডেটা ট্র্যাফিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে প্রতি সংযোগে প্রায় ১৩ জিবি-তে পৌঁছেছে। গড় ডাউনলোড গতি ৩৪ এমবিপিএস থেকে ৪৮ এমবিপিএসে বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে গড় ডাউনলোড গতি প্রায় ১০০ এমবিপিএসে পৌঁছেছে, তবে স্বল্পোন্নত, ভূমিবেষ্টিত উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটি এখনও ২০ এমবিপিএস-এর নিচে।

মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এটি মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের জন্য একটি বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২৩ সালে, ১২টি জরিপকৃত দেশের মধ্যে ৭টি দেশে ৮০%-এর বেশি জনসংখ্যা মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতন ছিল। তবে, এর অর্থ হলো যে ৫টি জরিপকৃত দেশে এখনও ২০৫০% জনসংখ্যা মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে কিছুই শোনেনি। নারীরা এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারীরা মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের মানুষের কাছে বড় বাধা হচ্ছে সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব। এরপর শহরের মানুষের কাছে নিরাপত্তা ও গ্রামের মানুষের কাছে সামর্থের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের বাধা হিসেবে গ্রামের ১১ শতাংশ ও শহরের ৮ শতাংশ মানুষ স্মার্টফোনের দামের বিষয়টি জানিয়েছেন। অন্যদিকে শহরের ২৮ শতাংশ ও গ্রামের ১৯ শতাংশ বলেছেন, লিখতে ও পড়তে না পারার কারণে তাঁরা মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে ব্যবহার করেছেন, তাদের আরও বেশি মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডেটার দাম সবচেয়ে বেশি বাধা বলে উল্লেখ করা হয়। এরপরে আছে যথেষ্ট সময় না থাকা।

বাংলাদেশে শহরের ৪১ শতাংশ এবং গ্রামের ২৬ শতাংশ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে মিসর, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, গুয়াতেমালা ও মেক্সিকো এগিয়ে রয়েছে। ইথিওপিয়া ও উগান্ডা শুধু বাংলাদেশের পেছনে আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে বেশি আগ্রহী।

যারা এরই মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতন, তাদের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো ব্যয় (বিশেষত হ্যান্ডসেটের) এবং সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব। জরিপকৃত দেশগুলোর মধ্যে ব্যয়বহুলতা (বিশেষ করে ইন্টারনেট সক্ষম হ্যান্ডসেট) মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উঠে এসেছে, বিশেষত সাব-সাহারান আফ্রিকায়। সাক্ষরতা ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিবন্ধকতা এবং এশিয়ার দেশগুলোতে এটি মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণের প্রধানপ্রতিবেদন বলছে, ন বাধা। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উদ্বেগ এবং প্রাসঙ্গিকতার অভাব তুলনামূলকভাবে কম উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা।

বেশিরভাগ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিদিন এটি ব্যবহার করেন, তবে ব্যবহার সাধারণত মাত্র এক বা দুইটি কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং অনেকেই এটি আরও বেশি ব্যবহার করতে চান। যোগাযোগ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিনোদন সবচেয়ে জনপ্রিয় কার্যকলাপ রয়ে গেছে। তবে, অন্যান্য কার্যকলাপের ব্যবহার কম এবং এটি দেশভেদে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। জরিপকৃত দেশগুলোতে গড়ে ৪৩% মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আরও বেশি ব্যবহার করতে চাওয়ার কথা জানিয়েছেন। আরও ব্যবহারের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো দেশভেদে ভিন্ন, তবে সাধারণত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উদ্বেগ, ব্যয়বহুলতা (বিশেষত ডেটার, তবে হ্যান্ডসেটেরও) এবং সংযোগের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ভিডিও কল ও অনলাইন ভিডিও দেখতে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে, যা ৯৩ শতাংশ। এরপরে ব্যবহৃত হয় অনলাইনে কথা বলায়, তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ও বিনোদনের জন্য। সবচেয়ে কম ১২ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করেন কৃষিবিষয়ক তথ্যের জন্য। আর চাকরি খুঁজতে ৩১ শতাংশ, অনলাইনে আয়ের জন্য ৪৫ শতাংশ, পড়াশোনা ও শেখা এবং সরকারি সেবার জন্য ৪৮ শতাংশ, খবর পড়তে ৬৮ শতাংশ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করা

যদিও মোবাইল ব্রডব্যান্ড কভারেজ সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, অনেকেই এখনও সংযুক্ত নয়, বিশেষত অনুন্নত এলাকাগুলোতে। আরও উন্নত মোবাইল ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ একটি প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে থাকবে। তবে, এটি ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে এবং সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। গ্রহণের অভাব অব্যাহত থাকায়, ব্যবহারের গ্যাপ মোকাবিলায় আরও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তি হওয়া উচিত ডিজিটাল বিভাজন, সংযুক্ত নয় এমন জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চাহিদা এবং তারা যে অনন্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা। প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণের জন্য শক্তিশালী, সময়োপযোগী এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ অপরিহার্য। এই ডেটা লিঙ্গ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয় অনুযায়ী বিভক্ত হওয়া উচিত, যা দেশভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে সহায়ক হবে।

সমন্বিত উদ্যোগ, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে, ব্যবহারের গ্যাপ এবং কভারেজ গ্যাপ দূর করার অগ্রগতি দ্রুততর করা সম্ভব। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে সবাই ডিজিটাল যুগে অংশগ্রহণ করতে এবং এর সুবিধা ভোগ করতে পারে। একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই মোবাইল ইন্টারনেটের রূপান্তরমূলক শক্তিতে প্রবেশাধিকার পাবে। নিম্নে জিএসএমএ প্রস্তাবিত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করার উপায় সংক্ষেপে প্রদান করা হলোঃ

জ্ঞান এবং দক্ষতা

ডিজিটাল দক্ষতা এবং সাক্ষরতা উন্নত করা, পাশাপাশি মোবাইল ইন্টারনেট এবং এর সুবিধাগুলির বিষয়ে সচেতনতা এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ব্যবহার শূন্যতা দূর করা যায় এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বিস্তৃত করা যায়। ডিজিটাল দক্ষতা উদ্যোগগুলিকে ব্যবহারকারীদের জীবনধারা এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা উচিত।

সাশ্রয়ী হ্যান্ডসেট এবং ডেটা প্রাপ্তি

সাশ্রয়ী হ্যান্ডসেট প্রাপ্তি এখনও একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এমন উদ্যোগ নেওয়া উচিত যা ইন্টারনেট-সক্ষম হ্যান্ডসেট এবং ডেটার খরচ কমানো যায়। উদ্ভাবনী ডেটা মূল্য নির্ধারণ কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে এবং হ্যান্ডসেট-ফাইন্যান্সিং বিকল্পগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। এছাড়া এসব সাশ্রয়ী করার প্রচেষ্টার মধ্যে কর নীতির গ্রহণ এবং ভর্তুকি প্রদান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটা ইন্টারনেট-সক্ষম ডিভাইস এবং ডেটার ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে অনলাইন হয়রানি বা সাইবার বুলিং, ভ্রান্ত তথ্য, ভুল তথ্য এবং প্রতারণা ইত্যাদি। এসব অনেককে অনলাইনে যেতে এবং ইতিবাচক ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রতিবন্ধিকতা তৈরি করছে। এই অনলাইন ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া এবং কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা গ্রাহকের আস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। অংশীদারদের উচিত ব্যবহারকারীদের, বিশেষত নারীদের জন্য এমন সহায়তা প্রদান করা যা তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বাড়িয়ে অনলাইন ঝুঁকি মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তোলে।

প্রাসঙ্গিকতা

অনেক নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম রয়েছে। নীতি, বিনিয়োগ এবং স্থানীয় উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমকে উন্নত করা সম্ভব। এর ফলে তা এমন স্থানীয় কন্টেন্ট, সেবা এবং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সহায়তা করবে যা মানুষের নিজস্ব ভাষায় তাদের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার পূরণ করবে।

অ্যাক্সেস

মোবাইল ব্রডব্যান্ড এবং সক্ষমকারী উপাদান যেমন বিদ্যুৎ, আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র, বিক্রয় এজেন্ট এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি বৈশিষ্ট্যগুলির অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করা সংযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অংশীদাররা মোবাইল ইন্টারনেট গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ মোবাইল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার উপর ফোকাস করে এবং সেবা, বিক্রয় চ্যানেল এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলি এমন অবহেলিত গোষ্ঠীগুলির জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে, যেমন নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, পাশাপাশি অ্যাক্সেসিবিলিটি বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করা এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ/আপগ্রেড করা।

নিবন্ধ

মোবাইল প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মোবাইল আর্থিক সেবাকে বাদ রাখলে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার কতো? বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে সব মিলে দেশের মোট বয়োপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির হার ৫২ শতাংশ। মোবাইল আর্থিক সেবাকে বাদ দিয়ে কেবল ব্যাংকের মাধ্যমে যদি আর্থিক অন্তভুক্তির হিসেব করা হয় তাহলে এই হার ২০ শতাংশের ধারে কাছে থাকে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই যে উদাহরণ সেটি যে খুব সুখকর নয়, সেটি বলার অপেক্ষাও রাখে না। তবে দেশের অর্ধেক মানুষকে অন্তর্ভুক্তিতে আনার কৃতিত্ব হিসেবে ধরলেও মোবাইল প্রযুক্তি খাত বিশেষ ধন্যবাদ পেতেই পারে। মোবাইল প্রযুক্তি যেভাবে লেনদেনকে সহজতর করে কোটি কোটি মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এনেছে - সেটা অন্য কোনো মাধ্যমে এতো সহজে করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু অনেক আলোচনা শেষে ভোটটা শেষতক মোবাইল প্রযুক্তির দিকেই পড়বে। বিশ্বব্যাংকের তরফে দেওয়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যই এর বড় উদাহরণ।

আবার আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ তথ্য দেখলেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, আগস্ট মাসে কার্যকর মোবাইল আর্থিক সেবার অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ছিল নয় কোটি ছয় লাখ ৪৫ হাজার। তার আগের মাসেও কার্যকর অ্যাকাউন্ট ছিল নয় কোটি ১৩ লাখ ১৬ হাজার। অন্যদিকে দেশে মোট নিবন্ধিত অ্যাকাউন্ট ২৩ কোটি পেরিয়ে গেছে। মোট অ্যাকাউন্টের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ অ্যাকাউন্ট কার্যকর থাকা কিন্তু অনেক বড় সংখ্যা। অনেক ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্টও কার্যকর থাকতে পারে ধরে নিয়েই বলছি, দেশের অন্তত পাঁচ কোটি লোক এখন নিজের মোবাইলে আর্থিক সেবার লেনদেন করছে। এর বাইরেও নিজের মোবাইল আর্থিক সেবার অ্যাকাউন্ট নেই কিন্তু এজেন্টের মাধ্যমে লেনদেন করেন (ওটিসি) এই অংকও নেহায়েত কম নয়। এজেন্টের মাধ্যমে লেনদেন অবৈধতার সুযোগ তৈরী করে সেটা সবার জানা - সেটা বিবেচনায় রেখেও বলতে হচ্ছে, মোবাইল আর্থিক সেবার পাঁচ কোটি কার্যকর বা সক্রিয় গ্রাহক বেশ বড় এক অর্জন। আর অর্জনের এই সোপান তৈরী হয়েছে পরিপূর্ণভাবে মোবাইল নেটওয়ার্কের ওপরে নির্ভর করে।

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় মোবাইল আর্থিক সেবার পাঁচ কোটি গ্রাহককে বড় অর্জন বলে মনে হলেও ১২-১৩ কোটি বয়োপ্রাপ্ত মানুষের দেশে এটি আসলে কি খুব বড় অর্জন? নিশ্চয়ই সামনের দিনে সম্ভাবনা আছে আরো অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার। আর সেখানেও মোবাইল প্রযুক্তি বা মোবাইল ফোন অপারেটররাই হবে বড় সহায়।

২০০৭ সালে কেনিয়ার এম-পিসা নামে বিশ্বের প্রথম মোবাইল আর্থিক সেবা চালু হয়। বোডাফোন এবং সাফারিকম নামে দুটি মোবাইল ফোন অপারেটর এসএমএস ভিত্তিক প্রথম ক্ষুদ্র আর্থিক লেনদেনের এই সেবার প্রচলন ঘটায়। বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরু হয় ২০১০ সালে। তবে এখন বাংলাদেশই এই সেবায় বিশ্বে রোল মডেল। আর এককভাবে বিকাশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ মোবাইল আর্থিক সেবা।

একটা সময় দেশের মোবাইল আর্থিক সেবার লাইসেন্সের সংখ্যা ২৯টিতে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক দফায় কমে কমে এখন সেটি ১৩টিতে এসে একটা স্থিতি পেয়েছে। এই ১৩টি অপারেটরের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য আছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে দেশে এখন বলতে গেলে হেন কোনো আর্থিক সেবা নাই যা মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে নেওয়া যায় না। তবে মোবাইল আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরে সবচেয়ে বড় অর্জন হল সাধারণ মানুষকে অর্থ লেনদেনে একটা গতি দেওয়া।

মাত্র কয়েক বছর আগেও ঢাকা থেকে কারো গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাতে কয়েক দিন লেগে যেতো। মোবাইল আর্থিক সেবা জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর থেকে এসব লেনদেন হয়েছে মুহূর্তের ব্যপার। লেনদেনের এই গতিই অর্থের ব্যবহার যোগ্যতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। একই অর্থ এখন দিনে কয়েক বার ব্যবহার করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রের উপযোগিতার হিসাব সামগ্রিক জাতীয় আয়ে রাখে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

প্রতিটি পন্য এবং সেবার ক্ষেত্রে যেমন একটা মূল উপাদান বা কাঁচামাল থাকে মোবাইল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক হল সেই কাঁচামাল। মোবাইল নেটওয়ার্কের এক সময়ের প্রায় অপ্রয়োজনীয় ইউএসএসডি চ্যানেলের ওপর দাঁড়িয়ে ২০১০ সালে সাজানো হয় মোবাইল আর্থিক সেবার কাঠামো। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে। একই ধারাবাহিকতায় প্রসার ঘটছে মোবাইল আর্থিক সেবা পরিকাঠামোর। বেড়েছে কলেবর। বিস্তৃত হয়েছে সুবিধার ডালা। এখন কি করা যায় না মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে?

প্রায় অব্যবহৃত ইউএসএসডি'র ওপর নির্ভর করে যাত্রা করলেও অল্প সময়েই মোবাইল আর্থিক সেবা এতোটা জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করল যে মোবাইল অপারেটরদেরও ক্যাপাসিটি বাড়াতে হল। এখন তো যতো মানুষ এইউএসএসডি দিয়ে লেনদেন করেন তারা প্রায় সমসংখ্যক মানুষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে লেনদেন করেন। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও চলছে হালের ফোরজি বা নিদেনপক্ষে থ্রিজি নেটওয়ার্কেরও পর। কখনো কখনো হয়তো ওয়াইফাইয়ের ডেটা ব্যবহার করে অ্যাপ ব্যবহার হয়; তা হলেও মোবাইল আর্থিক সেবার বিপরীতে সিমটা তখন মোবাইল ফোনে থাকা বাধ্যতামূলক। মোট কথা যেটা দাঁড়াচ্ছে, মোবাইল নেটওয়ার্কই আসলে মোবাইল আর্থিক সেবার পরিকাঠামো তৈরী করছে। সেই কাঠামোর ওপর অন্যান্য অলংকার যুক্ত হয়ে সেবার কলেবার প্রসারিত হয়েছে।

আর এই সব কিছুর যে যোগফল সেটাই হল মোবাইল আর্থিক সেবায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের এক নম্বর দেশ। সামগ্রিক লেনদেনের হার বিবেচনায় হয়তো এখনো মোবাইল আর্থিক সেবার অংক ততোটা বড় নয়। কিন্তু ক্যাশলেস অগ্রযাত্রায় কিন্তু মোবাইল আর্থিক খাত রাখছে বড় অবদান।

আগস্ট মাসেও মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে এক লাখ ৩৭ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। অথচ মাত্র চার বছর আগেও এই অংক মাসে ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো ছিল। চার বছরে লেনদেন চারগুন হওয়া কিন্তু চারটিখানি কথা নয়! চার বছর আগের তিন কোটি ৩২ লাখ একটিভ অ্যাকাউন্ট এখন নয় কোটি পেরিয়েছে। লেনদেনের অংকের সীমা একেবারেই কঠিন ছকে বাঁধা। দিনে ২৫ হাজার টাকার বেশী লেনদেন করতে পারেন না একজন গ্রাহক। মাসে যা তিন লাখ টাকা। তারপরেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আর লেনদেনে এই যে অংক সেটি অবশ্যই বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বড়। দিনকে দিন যতো বেশী সেবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উঠবে ততো বেশি ক্যাশলেস লেনদেনও জনপ্রিয় হবে। ফলে মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে লেনদেনের অংকও বাড়তেই থাকবে। আর এভাবেই নেপথ্যে থেকে অবদান রাখছে মোবাইল প্রযুক্তিখাত।

শুধু গ্রাহক বা লেনদেনের অংকই বা কেনো! নব্বই দশ থেকে শুরু করে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে বিপনন কাঠামো মোবাইল ফোন অপারেটররা তৈরি করেছে সেটার ওপরেই তো দাঁড়িয়েছে মোবাইল আর্থিক সেবার বিপনন কাঠামো। মোবাইল ফোন অপারেটরদের এজেন্টরাই এখন মোবাইল আর্থিক সেবার এজেন্ট। এ যেন পায়ের ছাপে পা দিয়ে এগিয়ে চলা।

মোবাইল ফোন এবং মোবাইল আর্থিক সেবা দুটো ক্ষেত্রেই হ্যান্ডসেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নদী পার হতে নৌকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ। হ্যান্ডসেটের প্রেক্ষাপটে আবার স্মার্টফোন মানেই আধুনিকতম সেবার দুয়ার অবাহিত। হ্যান্ডসেটের ওপর ট্যাক্স হ্রাস বা বৃদ্ধি মানেই তার একটা ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব মোবাইল শিল্প অথবা মোবাইল আর্থিক খাতের ওপর পড়বেই। এসব কিছু মিলিয়েই যে ছবিটা তৈরী হয়েছে সেখানে - মোবাইল ফোন অপারেটর ছাড়া মোবাইল আর্থিক সেবার একলা চলার আর সুযোগ নেই। মোবাইল ফোন খাত হয়তো একলা চলতে পারবে, কিন্তু মোবাইল আর্থিক সেবাকে শেষতক সওয়ার হতে হবে ওই মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের ওপরেই।

কিন্তু মজাটা হয় - যে সেবার জন্ম হয়েছে মোবাইল ফোন শিল্পের শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে। সেখানে তাদেরই আবার প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। সেই শুরু থেকে গত প্রায় দেড় দশকে মোবাইল ফোন অপারেটররা এই সেবাটিতে অংশগ্রহনের কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সুযোগ মেলেনি। সর্বশেষ ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার যে উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক নেয় সেখানে মোবাইল ফোন অপারেটরদের আবেদনের সুযোগ রাখা হলেও ওই পর্যন্তই। যদিও ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্সিং কার্যক্রম থেকে পরবর্তীতে অনেকটা পিছিয়ে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোবাইল আর্থিক সেবা অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসলেও এখনো অনেক বাঁধা এখানে রয়েছে। এক্ষেত্রে একটা সমালোচনা না করে পারাই যায় না। মোবাইল অপারেটরদের ভয়েস বা এসএমএস সেবার এক্ষেত্রে ইন্টারঅপারেবিলিটি আছে শুরু থেকেই। ইন্টারনেট ডেটা বিষয়ক সেবার ক্ষেত্রে তো এসব হিসাবের কোনো বালাই নেই। কিন্তু মোবাইল আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে ইন্টারঅপারেবিলিটি গ্রাহকের স্বাধীন লেনদেনের ক্ষেত্র সেভাবে তৈরি করতে পারেনি। অথচ অনেক কাঠামোবদ্ধ হয়েও ব্যাংকের লেনদেন ইন্টারঅপারেবিলিটি আছে। মুহূর্তেই লাখ লাখ টাকার লেনদেন হচ্ছে ইন্টারঅপারেবিলিটির সুবিধায়। অথচ মোবাইল আর্থিক সেবার এই বাঁধা প্রান্তসীমায় থাকা গ্রাহকদেরকে সম্ভাবনার দূয়ারে এক পা দিয়েও আটকে থাকার অবস্থা তৈরী করেছে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে সব মোবাইল আর্থিক সেবার মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সবাইকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল। ইন্টারঅপারেবিলিটির সেবার জন্যে তখন প্রতিটি লেনদেনে যে ফি'র কথা বলা হয়েছিল তাতে গ্রাহকের খরচ বরং আরো বেড়ে ওয়ার আশংকা তৈরী হয়, এই সমালোচনায় তখন বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নির্দেশনা ফিরিয়ে নেয়।

বিশ্বের খুব কম দেশেই মোবাইল আর্থিক সেবা চালু আছে। অধিকাংশ দেশেই কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং অনেক বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের প্রসার যেমন হয়েছে তেমনি এই ইকোসিস্টেমের ওপর দাঁড়িয়ে একে একে গড়ে উঠেছে অন্যান্য সহযোগী সেবা। মোবাইল আর্থিক সেবাও তেমনই একটি। তবে এখানে পার্থক্য হল মোবাইল ফোন আপারেটরদের চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল আর্থিক সেবার একটু বেশিই করার আছে। যেমন ক্যাশলেস সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই একটি কাজও সফলভাবে করা গলে দেশের আর্থিকখাতে চেহারাই অনেকটা বদলে যেতে পারে। টাকার উপযোগিতা বৃদ্ধি বা দুর্নীতি হ্রাস এমন অনেক সূচককে সহজেই অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে মোবাইল আর্থিক সেবা।

তথ্য সূত্র:

১. বিশ্বব্যাংকের ডিজিটাল প্রগ্রেস অ্যান্ড ট্রেন্ডস রিপোর্টস ২০২৩।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপোর্ট, আগস্ট ২০২৪।

লেখক: বিশ্লেষক; হেড অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স, নগদ

বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন

মোবাইল খাতের কর বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব এর ব্যবহার, গ্রাহক ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পড়বে

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোবাইল সেবা ব্যবহারের ওপর যে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং সিম সংযোগের ওপর ১০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর (মুসক) আরোপ করা হয়েছে তার ফলে মোবাইল গ্রাহক এবং এই শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে এমটব আগাম জানিয়েছিল। এসোসিয়েশন অফ মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অফ বাংলাদেশের (এমটব) বনানীস্থ অফিসে গত ১২ জুন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অপারেটরের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনায় অংশ নেন বাংলালিংক ডিজিটালের চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান, রবি আজিয়াটার চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, গ্রামীণফোনের তৎকালীন চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার হ্যান্স মার্টিন হেনরিক্সন এবং এমটব মহাসচিব লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)।

আলোচকরা বলেন, এর আগে এ ধরনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সেবার মূল্য বৃদ্ধি করা হলে গ্রাহকরা মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে দেন ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন রাজস্ব আহরণ কমে যায় অপরদিকে সরকারের কোষাগারেও প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

সিম সংযোগের উপর প্রদেয় ভ্যাট ২০০ থেকে ৩০০ টাকা করার কারণে মোবাইল গ্রাহকের প্রবৃদ্ধি অনেক কমে যাবে।

> করনীতি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের বিপরীত দিকেই হাঁটছে। কাজেই মোবাইল সেবার চলমান উন্নয়ন এবং গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রসার বেগবান করতে যৌক্তিক কর কাঠামোর কোন বিকল্প নেই।

মোবাইল খাতের নতুন করে করারোপ না করে তাকে যৌক্তিক অবস্থায় আনতে এনবিআরসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সরকাররের কাছে বার বার অনুরোধ করা হলেও এবার সরকার কর বৃদ্ধি করল অর্থনীতিতে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে বলে আমরা মনে করি। এর আগে আমরা সরকারের কাছে সুপারিশমালা তুলে ধরেছিলাম কিন্তু তার কোনকিছুই মানা হয়নি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য আনুযায়ী, দেশে ১৯ কোটি ২২ লাখ সিমকার্ডধারীর মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন ১২ কোটির বেশি গ্রাহক। বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে পড়াশোনা, কেনাকাটা, দাফতরিক কার্জকম- সব ক্ষেত্রেই বেড়েছে ইন্টারনেট ব্যবহার। অথচ স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এখনো টেলিকম সেবার বাইরে রয়েছে দেশের ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী। আমাদের প্রতিবেশি দেশের তুলনায় কয়েকগুন পিছিয়ে রয়েছে গ্রাহক পর্যায়ে ডাটা ব্যবহারেও। তবে এ খাতে গ্রাহক বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজস্ব বৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ যখন বিশ্ব দরবারে ডিজিটাল সেবা প্রদানে প্রশংসিত হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন করে গ্রাহকদের উপর আরও করের বোঝা বৃদ্ধি করা হলো। ফলে ১০০ টাকার মোবাইল সেবা ব্যবহারে গ্রাহকদের সর্বমোট কর দিতে হবে ৩৯ টাকা। যা হবে সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল মিলিয়ে একজন মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক মাসে গড়ে সাড়ে ৬ জিবি ডাটা ব্যবহার করেন। যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মাসে গ্রাহক ব্যবহার করে ২৭-২৯ জিবি। বাংলাদেশের গ্রাহকরা ভারতের তুলনায় ডাটা ব্যবহারে কয়েকগুন পিছিয়ে আছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রাহক পর্যায়ের মোবাইল ইন্টারনেট সেবার কর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মালেশিয়ায় ৬%, থাইল্যান্ড ৭%, নাইজেরিয়া ৭.৫%, সিঙ্গাপুর ৯%, ইন্দোনেশিয়া ১১%, ফিলিপাইন ১২%, ক্যাম্বোডিয়া ১৩%, ভারত ১৮%, শ্রীলঙ্কা ২৩.৫%, নেপাল ২৬.২%, বাংলাদেশ ৩৩.২৫% এবং পাকিস্তান ৩৪.৫% কর আরোপিত রয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এখনো টেলিকম সেবার বাইরে রয়েছে দেশের ৪২ শতাংশ জনগোষ্ঠী। বর্তমান মোবাইল সেবা ব্যবহারকারীদের ৬৩% মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং ৫৪% ৪জি গ্রাহক। অর্থাৎ বর্তমান মোবাইল সেবা ব্যবহারকারীদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো মোবাইল ইন্টারনেট সেবা (৩৭%) ব্যবহার করতে পারছে না এবং ৪জি সেবা (৪৬%) ব্যবহারের সক্ষমতাও অর্জন করতে পারেনি। এ খাতে গ্রাহক বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজস্ব বৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে।

সম্পূরক শুল্ক পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা রাজস্ব মিলবে। তবে করের পরিবর্তে ডাটা ব্যবহার বাড়িয়ে এই রাজস্ব আদায় সম্ভব।

করনীতি স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের বিপরীত দিকেই হাঁটছে। কাজেই মোবাইল সেবার চলমান উন্নয়ন এবং গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রসার বেগবান করতে যৌক্তিক কর কাঠামোর কোন বিকল্প নেই।

banglalink

সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে অংশীদারিত্বের অংশ হিসেবে বাংলালিংক ঢাকার সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপোতে প্রাথমিক পুনরুদ্ধার ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছে। সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে যে এই গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীগুলো বাংলাদেশের বন্যাকবলিত পরিবারগুলোর কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছেছে, যা কঠিন সময়ে তাদের জন্য সহায়ক ছিল।

সমাজের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের স্বীকৃতি স্বরূপ দ্য ডেইলি স্টার এবং সিএসআর উইন্ডো সম্প্রতি বাংলালিংককে 'বেস্ট সাসটেইনেবিলিটি এক্সিলেন্স ইনিশিয়েটিভ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এই সম্মাননা মাইবিএল সুপারঅ্যাপের প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়, যা সাইক্লোন মোখার পূর্বে সম্প্রদায়কে প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অ্যাপের সাইক্লোন ট্র্যাকার প্রায় দেড় লাখ মানুষ ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি সাইক্লোন মোখার পথে থাকা ১.৭ কোটি ব্যবহারকারী সাইক্লোনের গতিপথ সম্পর্কে পুশ নোটিফিকেশন পেয়েছেন।

গ্রামীণফোন

সাইক্লোন রেমাল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যাসহ নানা জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রামীণফোন সবসময় দুর্যোগকবলিত সম্প্রদায়গুলোর পাশে অটলভাবে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে গ্রামীণফোন ২০,০০০ পরিবারের জন্য খাদ্য ত্রাণ প্যাক, ২০,০০০-এর বেশি পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ১০,০০০-এর বেশি ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে ওষুধসহ চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেছে। এছাড়াও, গ্রামীণফোনের কর্মীরা ৩৬টি পরিবারের বাড়ি ও জীবিকা পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছেন।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির বাধা পেরিয়ে গ্রামীনফোন ৩২টি জেলার ২৯ লাখের বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে জীবন পরিবর্তনকারী ডিজিটাল দক্ষতায় সক্ষম করেছে। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে তৈরি কনটেন্ট নিয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ উঠান বৈঠকের মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে দুর্গম সম্প্রদায়গুলোর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে, যা ন্যায়সঙ্গত অগ্রগতি এবং টেকসই পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রেখেছে।

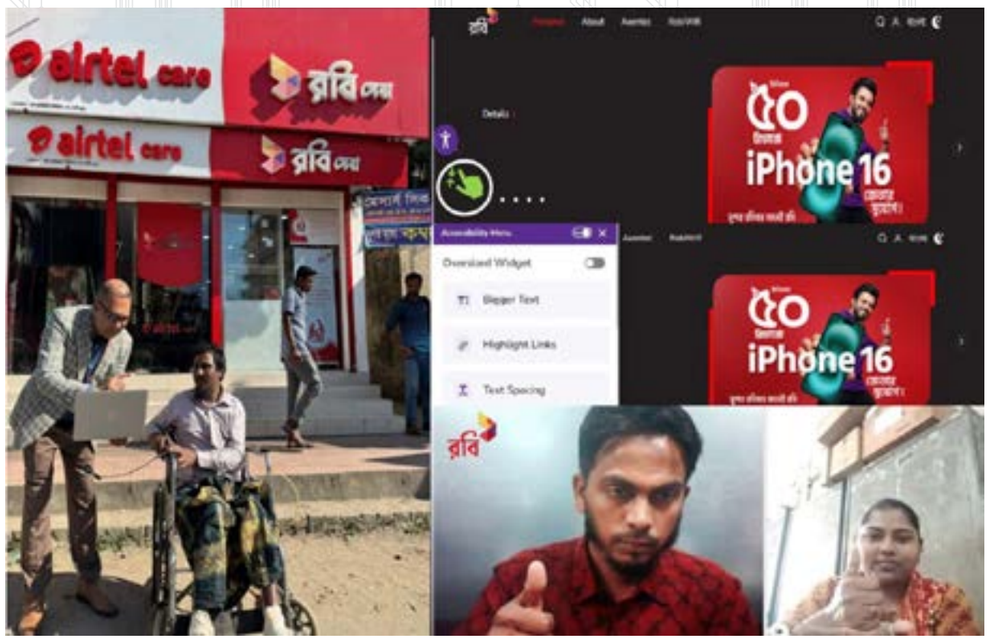

রবি আজিয়াটা বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের জন্য একটি ভিডিও চ্যাট সেবা চালু করেছে যা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রশিক্ষিত এজেন্টদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই সেবা রবির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা দেশে কার্যকর।

বিডিটিকিটস রবি আজিয়াটা লিমিটেডের প্রিমিয়াম অনলাইন টিকিটিং প্ল্যাটফর্ম। এর টিকিটিং সেবা এখন জাইতুন বিজনেস সলিউশন্স লিমিটেডের ২০০টিরও বেশি ভিলেজ ডিজিটাল বুথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আয়োজিত ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল মাবুদ চৌধুরী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বক্তব্য প্রদান করেন। রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে গত ১৭ ডিসেম্বর এ আয়োজন করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান সচিবালয়ে সম্প্রতি টেলিটকের নতুন মোবাইল প্যাকেজ জেনজি উদ্বোধন করেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল মাবুদ চৌধুরী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) উপস্থিত ছিলেন।

ERICSSON

বছরের প্রারম্ভে আয়োজিত এরিকসন বাংলাদেশের বার্ষিক নৈশভোজে প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি ম্যানেজার আব্দুস সালাম বক্তব্য রাখেন।

রাজধানীর একটি মিলনায়তনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে সেবা নিয়ে এরিকসনের কর্মকর্তারা অভ্যাগত অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন।

HUAWEI

বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য, হুয়াওয়ে বাংলাদেশ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করে। মেডিকেল ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ, ওষুধ, পানি বিশুদ্ধিকরণ কিট এবং পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি এই বন্যায় গৃহহীন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলির জন্য ২৫টি বাড়ি নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেলিকম বেস ট্রান্সসিভার স্টেশনের জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদনে হুয়াওয়ে এবং ওয়ালটন সম্প্রতি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির অধীনে ওয়ালটন বাংলাদেশে প্রায় সাত মাসের মধ্যে টেলিযোগাযোগ লিথিয়াম ব্যাটারি বাজারে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ওয়ালটনের স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮০,০০০ ইউনিট।

অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিটিআরসি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী (অব.) সম্প্রতি মোবাইল শিল্পের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে একটি আলোচনায় অংশ নেন।

বিটিআরসির কর্মকর্তাসহ মোবাইল অপারেটরদের কর্মকর্তারা সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ের একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

২০২৪ সালের প্রথমার্ধে আয়োজিত পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাজেট পূর্ব আলোচনায় সদস্য অপারেটরদের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এমটবের প্রস্তাবনা উপস্থাপন।

তড়িৎ চৌম্বকীয় রেডিয়েশনের প্রভাব

যদিও রাডার, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য উৎস হতে নিঃসৃত ননআয়োনাইজিং রেডিয়েশনের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে অনেক গবেষণা করা হয়েছে, এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

— ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাইন্টিফিক কমিটি অন হেলথ ইফেক্টস অফ এক্সপোজার টু ইএমএফ

ইএমএফ রেডিয়েশনের মূল শরীরবৃত্তীয় প্রভাব হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি। মোবাইল ফোন বা মোবাইল টাওয়ার হতে নির্গত ইএমএফ রেডিয়েশনের প্রভাব এতই কম মাত্রার যে সাধারণভাবে তা পরিমাপ করা যায় না। এটি ছাড়া অন্য কোন ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রভাব নেই।

টাওয়ার স্থাপিত ভবনে কি বেশি মাত্রার রেডিয়েশন হয়?

উত্তর- না। বরং এন্টেনার সিগনাল প্রপাগেশন, উচ্চতা এবং দূরত্ব বিবেচনায় টাওয়ারের নিচের বিল্ডিং এ খুব কম ইএমএফ (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড) রেডিয়েশন নির্গত হয়। সুতরাং হাসপাতাল, অফিস, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি ভবনে নিশ্চিন্তে টাওয়ার স্থাপন করা যেতে পারে।

জীবজন্তু বা উদ্ভিদের উপর ইএমএফ (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড) রেডিয়েশনের কোন প্রভাব প্রমাণিত নয়।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

যে সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে ইএমএফ রেডিয়েশন নির্গত হয়। নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন - এতে অণুর গঠন ভাঙ্গার মতো যথেষ্ট শক্তি নিহিত থাকে না।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা : প্রাসাদ ট্রেড সেন্টার (১০ম তলা),
৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
ফোন : +০৯৬৩৮০২৬৮৬২ ও +০২ ২২২২৮৪৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +০২২২২২৬৩১২১
ই-মেইল: **info@amtob.org.bd** ওয়েবসাইট : **www.amtob.org.bd**

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত
সম্পাদক : লে. কর্নেল মোহম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : **connexion@amtob.org.bd**